তাওহীদের ডাক

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৫

- সাংগঠনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের উপায়
- ইখলাছের পরিচয় ও পুরস্কার
- পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য
- প্রসঙ্গ : হলুদ সাংবাদিকতা ও ইহূদীদের বিশ্ব মিডিয়া কব্জা
- ওমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-এর রাজ্য শাসন
- মার্কিন নও-মুসলিম অ্যারোন সেলার্স-এর ইসলাম গ্রহণ

সাকা হাফংয়ের পথে

মালিকা পর্বতের গুপ্তধন সয়ফুল মুলক ঝিলে

হরতাল-অবরোধে দগ্ধ মানবতা : উত্তরণের উপায়

Contents

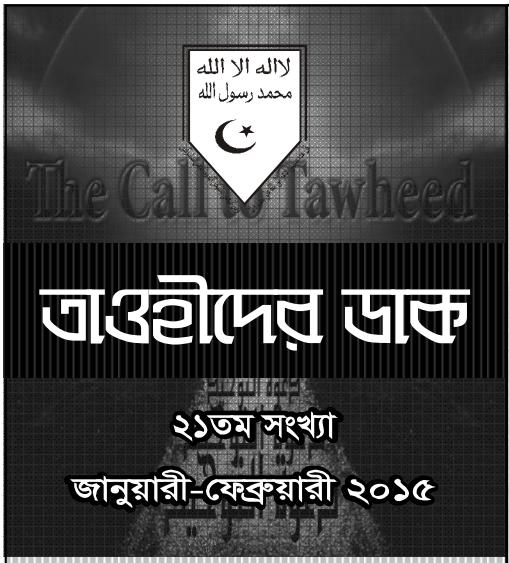

The Call to Tawheed

তাওহীদের ডাক

২১তম সংখ্যা

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৫

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
মুযাফফর বিন মুহসিন
নূরুল ইসলাম
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
বযলুর রহমান

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
সহকারী সম্পাদক : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৪৪-৫৭৬৫৮৯ (বিকাশ)
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www. tawheederdak.at-tahreek.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও ইমাম অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

➪ সম্পাদকীয় ২
➪ কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা ৩
➪ তানযীম ৫
সাংগঠনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের উপায়
অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন
➪ তারবিয়াত ৭
ইখলাছের পরিচয় ও পুরস্কার
আব্দুল গাফফার বিন আব্দুর রাযযাক
➪ ধর্ম ও সমাজ ১৩
পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য
বযলুর রহমান
➪ সাময়িক প্রসঙ্গ ১৯
হরতাল-অবরোধে দগ্ধ মানবতা : উত্তরণের উপায়
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম
➪ ধর্ম ও রাজনীতি ২৪
ওমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-এর রাজ্য শাসন
বযলুর রহমান
➪ চিন্তাধারা ২৭
প্রসঙ্গ : হলুদ সাংবাদিকতা ও ইহূদীদের বিশ্ব মিডিয়া কব্জা
মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
➪ আহলেহাদীছ আন্দোলন ৩৩
দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
➪ পূর্বসূরীদের লেখনী থেকে ৩৫
আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত ভাষণ
তাওহীদের ডাক ডেস্ক
➪ নিবন্ধ ৩৮
আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ : তথাকথিত শরী‘আত বিল
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
➪ পরশ পাথর ৪০
মার্কিন নও-মুসলিম অ্যারোন সেলার্স-এর ইসলাম গ্রহণ
তাওহীদের ডাক ডেস্ক
➪ জীবনের বাঁকে বাঁকে
(ক) মাওলানা ইসহাক ভাট্টির সাথে কিছুক্ষণ ৪২
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
(খ) প্রচলিত দ্বীন ৪৩
মঈনুল হক্ব মঈন
➪ ভ্রমণস্মৃতি
(ক) মালিকা পর্বতের গুপ্তধন সয়ফুল মুলক ঝিলে ৪৬
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
(খ) সাকা হাফং-এর পথে ৪৭
আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
➪ আলোকপাত ৫২
➪ সংগঠন সংবাদ ৫৪
➪ আইকিউ ৫৬

সম্পাদকীয়

বিপর্যস্ত দেশ : নৈতিক শক্তির জাগরণ আশু কাম্য

ক্ষমতা লাভ ও ক্ষমতা স্থায়ীকরণের দ্বৈত নীতির হিংস্র আক্রমণে শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশ আজ চরমভাবে বিপর্যস্ত। পোড়া দেহের দুর্গন্ধে বাংলার বাতাস দূষিত। হরতাল-অবরোধে জনজীবন অতিষ্ঠ। পুড়ছে মানুষ, পুড়ছে গাছ, জ্বলছে বাস-ট্রাক, পুড়ছে ঘর-বাড়ী ও বিভিন্ন আসবাবপত্র। বিপন্ন আজ জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। পেট্রোলবোমা ও ককটেলের আতঙ্কে মানুষ আজ দিশেহারা। বার্ন ইউনিটগুলোতে অগ্নিদগ্ধ অসহায় মানুষের আর্তনাদ ও স্বজনহারানো মানুষের কান্নার রোল তথাকথিত গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে করছে প্রশ্নবিদ্ধ। হুমকির সম্মুখীন করেছে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে। সচেতন দেশবাসীসহ সকলের একটিই প্রশ্ন, একি অবস্থা একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন জনগণের! যেখানে জীবনের এতটুকু নিরাপত্তা নেই। এরই নাম কি স্বাধীনতা! এরই নাম কি মানবাধিকার! দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এতকিছুর পরেও দেশের বড় দু'টি রাজনৈতিক জোটের নেতৃবৃন্দ আজ ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে গেছেন। কেউ কাউকে সামান্যতম ছাড় দিতে প্রস্তুত নন। ন্যায়-অন্যায় তাদের রঙ্গিন চোখে ঠাহর পাচ্ছে না। ফলে দেশ আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত।

হরতাল-অবরোধে চলছে নির্বিচারে পেট্রোলবোমা সন্ত্রাস। যার আগুন গ্রাস করছে নিরীহ সাধারণ মানুষের জীবন। নারী-শিশু, বৃদ্ধ-তরুণ, শ্রমজীবী-পেশাজীবী কেউ রেহাই পাচ্ছে না এর নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ থেকে। পৈশাচিক এ সহিংসতায় প্রতিনিয়ত বিপন্ন হচ্ছে মানবতা ও মানবাধিকার। বার্ন ইউনিটে দগ্ধ মানুষের গগণবিদারী আর্তচিৎকার বিবেককে করেছে ক্ষতবিক্ষত। লাঞ্ছিত মানবতার আহাজারী ও বেদনাদায়ক দৃশ্য হৃদয়কে করেছে হাহাকার। 'আমি আসলে দিনমজুর। কত রকম কাজ করে যে আমাকে সংসার চালাতে হয়। এখন কী করব। আমাকে কেন আগুনে পুড়ানো হল?', 'আমার কিছু হলে আমার পিতা-মাতাকে কে দেখবে?', 'আমার সন্তান আমার জন্য অপেক্ষা করছে' ইত্যাদি রকমের হাযারো লাঞ্ছিত মানবতার আর্তচিৎকারে বাংলার আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। অথচ ইহূদী-খ্রিষ্টানদের পা চাটা গোলাম মানবাধিকারের ফেরিওয়ালারা মুখে কুলুপ এটে বসে আছেন। অতএব এভাবেই লাঞ্ছিত মানবতা কি শুধু আর্তনাদ করেই ক্ষান্ত হবে?

শিক্ষা ক্ষেত্রে ১৫ লাখ শিক্ষার্থী আজ কোণঠাসা। অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্লাস ও পরীক্ষা সবই অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত। ফলে কোটি কোটি শিক্ষার্থীর জীবন আজ অনিশ্চয়তার পথে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। দৈনিক কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে। এফবিসিসিআই-এর পরিসংখ্যান মতে গত ৪৪ দিনে ক্ষতির পরিমাণ ১ লক্ষ ২০ হাযার কোটি টাকা। বাণিজ্য বন্দরগুলোতে মাল খালাস হচ্ছে না, আমদানীকৃত মালামাল সময়মত পৌঁছাচ্ছে না। দেশের টন টন উৎপাদিত কাঁচামাল নষ্ট হচ্ছে। পচনশীল সবজী ডাস্টবিনের খোরাকে পরিণত হচ্ছে। সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আয়-রোজগার কমে গেছে। যে দেশে রাত্রিবেলায় যানবাহন বন্ধ থাকে, প্রশাসন প্রহরায় মালবাহী ট্রাক পারাপারা হয় সে দেশকে কি প্রকৃতঅর্থে স্বাধীন রাষ্ট্র বলা চলে?

এভাবে কোন দেশ, কোন সমাজ চলতে পারে না। জাতির এই সংকটময় মুহূর্তে নৈতিকতাহীন রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে আমরা কোন কল্যাণের আভাষ পাচ্ছি না। প্রকৃতপক্ষে নৈতিক শক্তির জাগরণ ছাড়া এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার কোনই সুযোগ নেই। সেজন্যই নৈতিকতার জাগরণে আলেম সমাজের ভূমিকাই হবে অগ্রগণ্য। যদি বরাবরের মত এগুলোকে রাজনৈতিক গণ্ডগোল কিংবা দলাদলির বিষবাষ্প হিসাবে চিহ্নিত করে এড়িয়ে যাওয়া হয়, তবে সেটা প্রকৃতপক্ষে আমাদের দায়িত্বহীনতার দিকটাই উন্মোচিত করবে। সুতরাং আমরা দেশের এই সংকট মুহূর্তে জাতিকে উদ্ধারের জন্য ইসলামী শক্তিসমূহের জাগরণ কামনা করছি এবং সমস্যা সমাধানে তাদের বলিষ্ঠ ও নৈতিক ভূমিকা কামনা করছি। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য

আল-কুরআনুল কারীম :

১- آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

(১) 'রাসূল ও মুমিনগণ তাঁর (মুহাম্মাদ) প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর ঈমান এনেছেন। তাদের সকলে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। (তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং মান্য করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার ক্ষমা চাই। আর প্রত্যাবর্তন তো আপনার নিকটেই' *(বাক্বারাহ ২/২৮৫)*।

২- قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

(২) 'বলুন! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আল্লাহ তো কাফেরদেরকে পসন্দ করেন না' *(আলে ইমরান ৩/৩২)*।

৩- وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ.

(৩) 'আর আমি এসেছি তাওরাতে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে ও তোমাদের জন্য যা হারাম ছিল তার কিছুকে হালাল করতে এবং আমি তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর' *(আলে ইমরান ৩/৫০)*।

٤- وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

(৪) 'তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার' *(আলে ইমরান ৩/১৩২)*।

٥- وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

(৫) 'স্মরণ কর! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং যে অঙ্গীকারে তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছেন তা। যখন তোমরা বলেছিলে, শুনলাম ও মান্য করলাম এবং আল্লাহকে ভয় কর। অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ তো সবিশেষ অবহিত' *(মায়েদা ৫/৭)*।

٦- وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

(৬) 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর এবং সতর্ক হও; যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ, আমাদের রাসূলের একমাত্র কর্তব্য শুধু প্রচার করা' *(মায়েদা ৫/৯২)*।

٧- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ.

(৭) 'হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তার কথা শ্রবণ করছ, তখন তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না' *(আনফাল ৮/২০)*।

٨- وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي.

(৮) 'হারূন তাদেরকে পূর্বেই বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! এটা দ্বারা তো কেবল তোমাদের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়; সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আদেশ মেনে চল' *(ত্বহা ২০/৯০)*।

٩- وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ.

(৯) 'তারা বলে, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করলাম; কিন্তু এর পর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; বস্তুতঃ তারা মুমিন নয়' *(নূর ২৪/৪৭)*।

١٠- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ.

(১০) 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর (তাদের অমান্য করে) তোমাদের কর্ম বিনষ্ট কর না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*।

١١- فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

(১১) 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা শোন, মেনে নাও ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য; যারা তাদের অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

١٢- تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

(১২) 'এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। অতএব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটা মহাসাফল্য' *(নিসা ৪/১৩)*।

١٣- وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

(১৩) 'যে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করল সে ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে, যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নবীগণ, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ এবং এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী' *নিসা ৪/৬৯)*।

١٤- أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.

(১৪) 'তারা কী আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন চায়? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সমস্তই ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। আর তাঁর দিকেই তারা প্রত্যাবর্তিত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৩)*।

١٥- وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

(১৫) 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন' *(আনফাল ৮/৪৬)*।

হাদীছে নববী থেকে :

١٦- عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا.

(১৬) আবু সাঈদ ইবনু আবু বুরদা (রাঃ) তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) মু'আয ও আবু মূসাকে ইয়ামানে প্রেরণের সময় বলেন, তোমরা লোকদের প্রতি কোমলতা করবে, কঠোরতা করবে না। সুসংবাদ দিবে, ঘৃণা সৃষ্টি করবে না। পরস্পর একমত হবে, মতভেদ করবে না *(বুখারী হা/৩০৩৮; মুসলিম হা/৪৬২৩)*।

١٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ.

(১৭) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যদি তোমাদের ওপর এমন কোন হাবশী গোলামকেও শাসক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়, যার মাথাটি কিসমিশের মত তবুও তার কথা শোন ও আনুগত্য কর *(বুখারী হা/৭১৪২; মিশকাত হা/৩৬৬৩)*।

١٨) عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا آمَنَ بِعِيسَى ثُمَّ آمَنَ بِى فَلَهُ أَجْرَانِ وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ.

(১৮) আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তার দাসীকে শিষ্টাচার শেখায় এবং তা উত্তমভাবে শেখায় এবং তাকে দ্বীন শেখায় আর তা উত্তমভাবে শেখায়। অতঃপর তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে তার জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে। আর যদি কেউ ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনে অতঃপর আমার প্রতি ঈমান আনে, তাহলে তার জন্য দু'টি নেকী রয়েছে। আর দাস যদি তার প্রভুকে ভয় করে এবং তার মনিবকে মান্য করে, তাহলে তার জন্য দু'টি নেকী রয়েছে *(বুখারী হা/৩৪৪৬)*।

١٩) عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ إِنَّ خَلِيلِى أَوْصَانِى أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ وَأَنْ أُصَلِّىَ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ وَإِلاَّ كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً.

(১৯) আবু যার (রাঃ) বলেন, আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ ছাঃ) আমাকে এ মর্মে অছিয়ত করেছেন যে, তুমি শুনবে এবং আনুগত্য করবে যদিও সে কানকাটা গোলাম হয়। আর তুমি সময়মত ছালাত আদায় করবে। যদি তুমি এমন কোন গোত্রকে পেয়ে যাও এমন অবস্থায় যে, তারা ছালাত আদায় করছে তবে তাদের সাথে ছালাতে যোগ দান কর। কেননা এটা তোমার জন্য নফল হবে *(মুসলিম হা/১৪৯৯)*।

٢٠) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِى فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

(২০) জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট তাঁর কথা শুনার ও তাঁর আনুগত্য করার এবং সকল মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনার বায়'আত করলাম। তিনি আমাকে এটাও শিখিয়ে দিলেন যে, যতটা আমি সক্ষম হব *(বুখারী হা/৭২০৪; মুসলিম হা/২১০)*।

٢١) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا وَلاَ نَخَافَ فِى اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.

(২১) ওবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এই মর্মে বায়'আত করলাম যে, আমরা আপনার কথা শুনব ও মেনে চলব স্বচ্ছলতায় ও অস্বচ্ছলতায়, সন্তুষ্টিতে ও অসন্তুষ্টিতে। আমরা আমাদের উপর কাউকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে ঝগড়া করব না এবং আমরা যেখানেই থাকি হক্ব বা সত্য কথা বলব। আর এক্ষেত্রে কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে পরোয়া করব না *(মুসনাদে আহমাদ হা/২২৭৭৭, সনদ ছহীহ)*।

٢٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.

(২২) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যতক্ষণ আল্লাহ্র নাফরমানীর নির্দেশ না দেয়া হয়, ততক্ষণ পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় সকল বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের তা আনুগত্য করা কর্তব্য। আর যখন নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া হবে তখন আর কোন আনুগত্য চলবে না *(বুখারী হা/৭১৪৪; মিশকাত হা/৩৬৬৪)*।

٢٣) عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ.

(২৩) আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। দৈনিক পাঁচবার ছালাত আদায় কর, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর, তোমাদের মালের যাকাত আদায় কর, নেতার নির্দেশ মানবে তাহলে তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে *(তিরমিযী হা/৬১৬; মিশকাত হা/৫৭১, সনদ ছহীহ)*।

٢٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَيَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ.

(২৪) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে তাঁর কথা শুনার ও আনুগত্য করার বায়'আত করেছিলাম। অতঃপর তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে, তোমাদের সাধ্যমত (আনুগত্য করবে) *(তিরমিযী হা/১৫৯৩, সনদ ছহীহ)*।

মনীষীদের বক্তব্য থেকে :

১. আবুল বুখতারী (রহঃ) বলেন, আমি শাসক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র আনুগত্যকে ভালবাসি।

২. ত্বলক্ব ইবনু হাবীব বলেন, আল্লাহ্র আনুগত্য করা ও অবাধ্যতা পরিত্যাগ করার নামই তাক্বওয়া।

সারবস্তু

১. আনুগত্য জান্নাতের সুসংবাদ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ।
২. বান্দার আত্মিক পরিশুদ্ধি ও হক্বের প্রতি দৃঢ়তার আলামত আনুগত্য।
৩. আনুগত্যের মাধ্যমে হৃদয়ে প্রশান্তি আসে।
৪. আনুগত্য আল্লাহ্র মুহব্বত ও সন্তুষ্টি লাভের উপায়।
৫. দ্বীনের সত্যায়ন ও একনিষ্ঠতার চিহ্ন হল আনুগত্য।
৬. সর্বাবস্থায় নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যশীল হতে হবে। নেতার মধ্যে অপসন্দনীয় কিছু দেখলে ধৈর্যধারণ করতে হবে।

সাংগঠনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের উপায়

-অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

ভূমিকা :

কর্মীরা সংগঠনের মূল চালিকা শক্তি। দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মী ছাড়া যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি হয় না। যোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন গতিশীল হয় না। আর সংগঠন গতিশীল না হলে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। উল্লেখ্য যে, সূর্যকে কেন্দ্র করেই সৌরজগত পরিচালিত হয়। অনুরূপভাবে যোগ্য নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে সংগঠনের কর্মীরা পরিচালিত হয়। এজন্য নেতার দায়িত্ব কর্মীদেরকে যোগ্য ও অভিজ্ঞ করে গড়ে তোলা। আর এটা রাতারাতি সম্ভব নয়। এর নেই কোন শর্টকার্ট রাস্তা। এজন্য প্রয়োজন দীর্ঘ পরিকল্পনা ও যুগোপযোগী কর্মসূচীর; সেই সাথে তা বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে কর্মীদের সাংগঠনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের কিছু উপায় আলোচনা করা হল :

১. সাংগঠনিক প্রজ্ঞা :

ইসলামের প্রথম বাণী হল, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ‘পড়ুন! আপনার প্রভুর নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন’ *(আলাক্ব ১/৯৬)*। আল্লাহ বলেন, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ‘হে নবী! আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি উভয়ই সমান’ *(যুমার ৩৯/৯)*। জগৎ বিখ্যাত হাদীছের পণ্ডিত ইমাম বুখারী (রহঃ) অধ্যায় রচনা করেছেন, باب العلم قبل القول و العمل ‘কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন করা’। অতএব সাংগঠনিক কাজের পূর্বেই সংগঠন সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

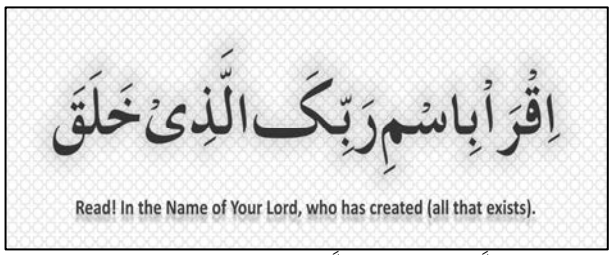

সংগঠনের মৌলিক উপাদান হল তিনটি। যথা- যোগ্য নেতৃত্ব, নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী। এই তিনটির সমন্বিত নাম হল সংগঠন। একজন সংগঠক হিসাবে এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে। তাহলে সংগঠন গতিশীলতা লাভ করবে।

২. দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি :

দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি যে কোন কাজের সফলতার মানদণ্ড। অপরদিকে কাজে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি না থাকলে সফলতা লাভ করা যায় না। সর্বক্ষেত্রে সে ব্যর্থ হয়। তাই একজন কর্মীকে সংগঠক হওয়ার জন্য তার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই। দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করা ছাড়া যোগ্য সংগঠক হওয়া যায় না। ইংরেজীতে একটি কথা আছে Well begun is half done ‘কোন কাজ ভালভাবে আরম্ভ করা মানে অর্ধেকটা সম্পন্ন হয়ে যাওয়া। এতে কাজে সফলতা আসে।

৩. পরিকল্পিত কাজ :

যিনি দক্ষ সংগঠক হবেন তাকে পরিকল্পিত কাজ করতে হবে। বলা হয় যে, পরিকল্পনা হল কাজের অর্ধেক। Plan বা নকশা ছাড়া কাজ করলে সফলতা লাভ করা যায় না। পরিকল্পিতভাবে কাজ করলে, অল্প অল্প করলেও বরকত হয়। লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়া যায়।

৪. কর্মনীতি মূল্যায়ন :

জগত বিখ্যাত সংগঠকদের কর্মময় জীবন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করুন। তাদের সফলতার পিছনে কোন্ কোন্ বিষয়গুলো সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে তা চিহ্নিত করে সে আলোকে নিজেকে গড়ে তুলুন। যা নিজ দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিখ্যাত সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠক মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমাদের জন্য মডেল। তার কর্মময় সোনালী জীবনকে মূল্যায়ন করে আমাদেরকে সম্মুখপানে অগ্রসর হতে হবে।

৫. সংগঠন বিষয়ে বইপত্র পাঠ :

সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে স্ব স্ব স্তরের নেতা ও কর্মীদেরকে নিয়মিত সংগঠন সম্পর্কিত বইপত্র পাঠ করতে হবে। অপরদিকে বিশিষ্ট সংগঠকদের বইপত্র সংগ্রহ ও পাঠের মাধ্যমে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার ঝুলিকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করতে হবে।

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

‘তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না’।

–(আলে ইমরান ৩/১০৩)

৬. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন :

একজন নেতা ও কর্মীকে চোখ কান খোলা রেখেই নিয়মিত কাজ করে যেতে হবে। নিজ দেশ ও জাতি সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এভাবে দূরদর্শী নেতা ও কর্মী হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। এভাবে সংগঠন গতিশীল হবে।

৭. কর্মবণ্টন নীতি :

কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মবণ্টন করে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের সুযোগ করে দেওয়া একজন যোগ্য নেতার প্রধান কাজ। এ কাজে নেতা যত তৎপর হবেন কর্মীরা তত কর্মচঞ্চল

হবেন। দায়িত্বের পাশাপাশি জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করতে হবে। এতে কর্মীদের মাঝে দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত হবে এবং সংগঠনের কাজে গতি বৃদ্ধি পাবে।

৮. আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার :

দক্ষ সংগঠক শারঈ জ্ঞানের পাশাপাশি প্রযুক্তি জ্ঞানে অভিজ্ঞ হবেন এবং কর্মীদের সেভাবে গড়ে তুলবেন। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তাওহীদ ও সুন্নাতের দাওয়াতকে সর্বত্র

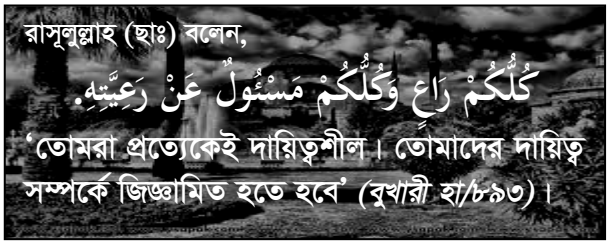

ছড়িয়ে দিবেন। ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী আদর্শ উজ্জ্বল হবে। সংগঠনের দাওয়াত বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে।

৯. সাংগঠনিক কাঠামো :

একজন দক্ষ সংগঠক সাংগঠনিক কাঠামোকে মযবুত করে গড়ে তুলবেন। সংগঠনের ভিত্তি মযবুত হলে কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে। সাংগঠনিক কাঠামোকে মযবুত করার জন্য সংঘবদ্ধ কর্মীদের মাঝে মধুর সু-সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। পক্ষপাতহীন কর্মঠ ন্যায়পরায়ণ ও দায়িত্বানুভূতি সম্পন্ন কর্মীদের মধ্য হতে গঠনতান্ত্রিক নিয়ম অনুযায়ী দায়িত্বশীল পরিষদ গঠন করা এবং সকল বিষয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করলে সাংগঠনিক কাঠামো মযবুত হবে।

১০. নেতা ও কর্মী সম্পর্ক :

নেতা ও কর্মীর সম্পর্ক হবে সু-মধুর ও টেকসই একটি পরিবারের মত। যেখানে থাকবে শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসা ও ভক্তি। জুনিয়র কর্মী সিনিয়র কর্মীরদের প্রতি হবে শ্রদ্ধাশীল আবার সিনিয়র কর্মী বা দায়িত্বশীল নেতা জুনিয়র কর্মীদের প্রতি হবেন স্নেহ পরায়ণ এবং তাদের হক্ব আদায়ে হবেন সর্বদা সচেতন। এভাবে নেতা ও কর্মীদের মাঝে আন্তরিক পরিবেশ তৈরি হলে সংগঠনের গতি বৃদ্ধি পাবে।

১১. ভুলত্রুটি সংশোধন :

আদম সন্তান হিসাবে কর্মীরা ভুল করবে। দূরদর্শী নেতা হিসাবে কর্মীদের ভুল শুধরিয়ে দিবেন। ভুল সংশোধনের সুযোগ দিবেন। যদি সংগঠনের নিয়ম-নীতি বহির্ভূত কোন কাজ নেতা-কর্মীর দ্বারা সংগঠিত হয় তাহলে গঠতান্ত্রিকভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে পরস্পরের দোষত্রুটি গোপন রেখে সংশোধনের জন্য সার্বিক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এতে আল্লাহ্র রহমত নেমে আসবে সংগঠনের কাজে বরকত হবে।

১২. নেতৃত্ব ও আনুগত্য :

নেতা ছাড়া যেমন আন্দোলন হয় না। তেমনী কর্মী ছাড়া আন্দোলন সফল হয় না। তাই ইসলামে নেতৃত্ব ও আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তাকে খুব গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ 'আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন, নেতার আদেশ শ্রবণ, নেতার আনুগত্য, হিজরত এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৯৪, সনদ ছহীহ)*। অতএব আল্লাহ্র প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য এবং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ছাহাবীগণের আনুগত্যের মূল্যায়ন করে দায়িত্বশীলদের প্রতি গভীর আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। এতে সংগঠনের উপর আল্লাহ্র রহমত নেমে আসবে ও কাজকর্মে বরকত হবে।

১৩. প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা :

আল্লাহ বলেন, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ 'আর তাদের বিরুদ্ধে সব ধরনের শক্তি নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ কর' *(আনফাল ৮/৬০)*। তাই বলা যায়, সাংগঠনিক জীবনের সকল স্তরে প্রশিক্ষণ দরকার। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনে কর্মীদের প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। এজন্য মাঝে মাঝে দক্ষ প্রশিক্ষকদের দ্বারা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যরূরী। যাতে কর্মীরা আধুনিক নব্য জাহেলিয়াতের মোকাবেলায় ময়দানে যিন্দাদিল মর্দে মুজাহিদ হিসাবে টিকে থাকতে পারে।

১৪. পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা :

বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার। এজন্য নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করা দরকার। মহান আল্লাহ আদম (আঃ) থেকে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূলকে পরীক্ষা করে মানব জাতির নেতা হিসাবে সম্মানিত করেছেন। মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ) তাঁর জীবনে বহুমুখী পরীক্ষার সম্মুখীন হন। অতঃপর তিনি মানব জাতির নেতা হন। আল্লাহ বলেন, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا 'যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন অতঃপর তিনি তাতে উত্তীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ বলেন, আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করলাম' *(বাক্বারাহ ২/১২৪)*। পরীক্ষাতেই পুরস্কার। তাই পরীক্ষিত কর্মীকে সামনে নিয়ে আসা এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা একজন দূরদর্শী যোগ্য নেতার প্রধান কাজ। এক্ষেত্রে নেতা ভুল করলে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত

হবে এবং সংগঠনের গতি ব্যাহত হবে।

অতএব পরিশেষে আমরা বলব যে, নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডবাহী এদেশের একক যুব সংগঠন **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর নেতা ও কর্মীদেরকে সাংগঠনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনে আন্তরিক হতে হবে। আধুনিক এই নব্য জাহেলী সমাজ পরিবর্তনে নিজেকে যোগ্য হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। কথা, কলম ও সংগঠন জিহাদের এই ত্রিমুখী হাতিয়ার নিয়ে সমাজ সংস্কারের কণ্টাকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন-আমীন!!

[লেখক : কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

ইখলাছের পরিচয় ও পুরস্কার

-আব্দুল গাফফার বিন আব্দুর রাযযাক

ভূমিকা :

ইখলাছ হল দ্বীনের মূল ভিত্তি এবং সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ, যা ব্যতীত বান্দার ইসলাম অসম্পূর্ণ। আর ইখলাছ ছাড়া আল্লাহ কোন ফরয বা নফল ইবাদত গ্রহণ করেন না। তাই ইসলামে ইখলাছের গুরুত্ব সর্বাগ্রে। কেননা এর উপরেই নির্ভর করে সমস্ত আমল গ্রহণ হওয়া না হওয়া।

ইখলাছের পরিচয় :

ইখলাছ (الإخلاص) শব্দটি আরবী। এটি বাবে إفعال এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ, تصفية الشيئ و تنقيته 'কোন বস্তুকে পরিষ্কার করা বা স্বচ্ছ করা'। যেমন বলা হয়, خلص الشيئ من الشوائب إذا صفا وخلصه أزال عنه ما يكدره 'সংমিশ্রিত বস্তু থেকে কোন বস্তুকে আলাদা করলে সেটা খাঁটি বা নির্ভেজাল হয়'।[১]

পরিভাষায় هو قصد المعبود وحده بالعبادة 'ইবাদতের মাধ্যমে শুধু আল্লাহকেই উদ্দেশ্য করা'। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا 'সে তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে শরীক করে না' *(কাহাফ ১৮/১১০)*।

ইবনু 'আশূর (রহঃ) বলেন, أن يكون الداعى إلى الإتيان بالمأمور وإلى ترك المنهى إرضاء الله تعالى 'দাঈ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তাঁর নির্দেশিত বস্তু পালন করবে এবং নিষেধকৃত বস্তু থেকে বিরত থাকবে'।[২]

ইসলামে ইখলাছের অবস্থান :

ইখলাছই হচ্ছে দ্বীনের মূল বস্তু। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ 'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে' *(বাইয়্যেনাহ ৯৮/৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ 'বলুন! আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করতে' *(যুমার ৩৯/ ১১)*। তিনি আরো বলেন, فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ– أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ 'সুতরাং আপনি আল্লাহ্র ইবাদত করুন তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। জেনে রাখুন! অবিমিশ্র আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্রই প্রাপ্য' *(যুমার ৩৯/২-৩)*।

আর ইখলাছ হচ্ছে রাসূলগণের দাওয়াতের চাবি, যা নিয়ে তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন। তাদের দাওয়াতের এটিই ছিল সুমহান মূলনীতি। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 'আল্লাহ্র ইবাদত করার ও ত্বাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি' *(নাহল ১৬/৩৬)*।

অন্তরের আমলের মেরুদণ্ড হচ্ছে ইখলাছ, যার ফলে বান্দার আমলগুলোর মর্যাদা বেড়ে যায়। এই কথাটি ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) আরো সুস্পষ্ট করে বলেন, 'অন্তরের আমল হচ্ছে ইবাদতের রূহ ও সারবত্তা, যখন দৈহিক আমল তা থেকে মুক্ত হবে তখন সেটা রূহ ব্যতীত একটি মৃত দেহের ন্যায়। আর নিয়তই হচ্ছে অন্তরের আমল'।[৩] তিনি আরো বলেন, প্রকৃতপক্ষে দৈহিক ইবাদত নিয়তের অনুগামী ও পরিপূরক। কেননা নিয়তটা হচ্ছে রূহের স্থলাভিষিক্ত এবং আমল হচ্ছে দেহের ন্যায়। যেমনভাবে শরীর থেকে আত্মা বের হয়ে গেলে সেই শরীরের কোন মূল্য নেই, তেমনই নিয়ত ব্যতীত কোন আমল করলে তা অনর্থক। তাই দৈহিক ইবাদতের হুকুম অবগত হওয়ার চেয়ে

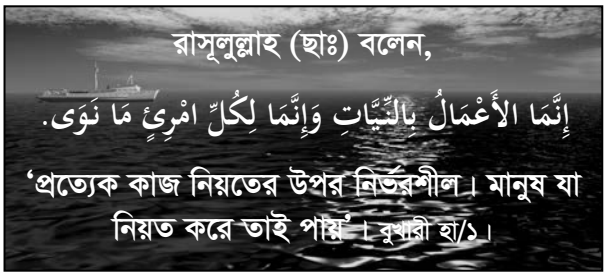

অন্তরের হুকুম অবগত হওয়ার গুরুত্ব অত্যধিক। অতএব নিয়ত হল আসল আর আমল হল তার শাখা।

অন্তরের আমল দৈহিক আমলের চেয়ে অধিকতর বড় ফরয। কেননা একজন মুমিনকে মুনাফিক থেকে অন্তরের আমল ব্যতীত বাছাই করা কি সম্ভব? আর অন্তরের আমলের পরিশুদ্ধতা ছাড়া শুধুমাত্র দৈহিক আমলের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে মুসলিম মনে হলেও আল্লাহ্র দরবারে সে মুসলিম হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করবে না। এই কারণেই অন্তরের ইবাদত দৈহিক ইবাদতের চেয়ে সুমহান; বরং ওয়াজিব। এজন্য সর্বদা অন্তরের ঈমান থাকা ওয়াজিব এবং কিছু কিছু সময়ে অঙ্গপ্রতঙ্গে ইসলাম থাকা ওয়াজিব। তাই ঈমানের ঘাঁটি হল অঙ্গপ্রতঙ্গ।[৪] সেটি হচ্ছে ইবাদত গ্রহণের দু'টি শর্তের একটি । দু'টির কোন একটি ব্যতীত কোন ইবাদত গৃহীত হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নিখাঁদচিত্তে ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনার উদ্দেশ্যে কৃত আমল ছাড়া গ্রহণ করেন না'।[৫]

অন্যদিকে এই গুণে যারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন। তিনি মূসা (আঃ) সম্পর্কে বলেন, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا 'স্মরণ করুন এই কিতাবে মূসার কথা, সে ছিল বিশেষভাবে মনোনীত এবং সে ছিল রাসূল ও নবী' *(মারইয়াম ১৯/৫১)*। ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে বলেন, كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا

১. মু'জামু মাক্বায়িসিল লুগাহ ২/২০৮ পৃঃ।
২. আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর লি ইবনে 'আশূর ২৩/৩৮ পৃঃ।
৩. বাদাইয়ুল ফাওয়ায়েদ ৩/১৯২ পৃঃ।
৪. বাদাইয়ুল ফাওয়ায়েদ ৩/১৮৭-১৯৩ পৃঃ।
৫. আবুদাঊদ ২/৬৫৯; নাসাঈ ৩১৪০, সনদ ছহীহ।

الْمُخْلَصِينَ ‘আমি তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার জন্য এভাবে নির্দেশ দিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত’ *(ইউসুফ ১২/২৪)*। মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে বলেন, قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ‘বলুন! আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা কী আমাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? যখন তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক! আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের এবং তাঁর প্রতি আমরা একনিষ্ঠ’ *(বাক্বারাহ /২১৩৯)*। উক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইখলাছ হচ্ছে নবী ও রাসূলগণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন।

পক্ষান্তরে এর বিপরীতে আল্লাহ পাক কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইখলাছ মুক্ত কোন আমল করবে তার জন্য পরকাল অতি ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করা ক্ষমা করেন না। এ ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন’ *(নিসা ৪/৪৮)*। وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ‘আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব’ *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, ‘ঐ সমস্ত আমল, যেগুলো সুন্নাত অনুপাতে ছিল না অথবা তাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কাম্য ছিল না’।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ‘ঐ সব মুশরিকদের আমল, যেগুলোকে তারা মনে করত এই আমলগুলো তাদের নাজাতের মাধ্যম হবে, আর সে আমলগুলো গ্রহণের শর্ত অনুযায়ী ছিল না। শর্তদু’টি হল, আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠভবে আমল করা এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ ‘আমি শিরককারীদের শিরক হতে মুক্ত, যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যাতে আমার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করল তাহলে আমি তাকে ও তার অংশীদারকে পরিত্যাগ করলাম’।[৬] مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ العُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ ‘যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করে আলেমদের উপর গৌরব করার জন্য অথবা জাহেল-মূর্খদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার জন্য অথবা মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন’।[৭] এই কারণে প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ইবাদতে ইখলাছ হচ্ছে মৌলিক উদ্দেশ্য। ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) ইখলাছের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, ‘ইখলাছ বিহীন আমল ঐ মুসাফিরের ন্যায়, যে তার ব্যাগ বালি দ্বারা পূর্ণ করে বহন করে আর তা তার কোন উপকারে আসে না’।

ইখলাছ অত্যন্ত কঠিন বিষয় :

৬. মুসলিম হা/২৯৮৫।
৭. তিরমিযী হা/২৬৫৪, সনদ ছহীহ।

ইখলাছের বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কেন যেন নাফসের উপর এটি সর্বাপেক্ষা কঠিন বিষয়। কারণ ইখলাছ এবং প্রবৃত্তি নাফসের মাঝে ঘূর্ণায়মান। তাই ইখলাছ বাস্তবায়ন করতে এবং অটুট রাখতে বড় সাধনা ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আর এই প্রচেষ্টা শুধুমাত্র জনসাধারণের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আলেম ওলামা, সালাফে-ছালেহীন, আবেদ, নির্বিশেষে সকলেই এর মুখাপেক্ষী। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, ما عالجت شيئا أشد على من نيتي إنها تنقلب على ‘আমার নিয়তের চেয়ে কঠিন কোন বিষয় সংশোধনের চেষ্টা করিনি। আমার বিপরীতেই তা মোড় নেয়।[৮] এ সম্পর্কে ইউসুফ ইবনুল হাসান বলেন, ‘পৃথিবীর বুকে সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু হল ইখলাছ। আমি কতই না চেষ্টা করেছি আমার অন্তর থেকে রিয়া দূর করতে। আমি যতই চেষ্টা করি তা দূর করতে কিন্তু সেটি অন্যরূপে আবার আবির্ভূত হয়’।[৯]

ইউসুফ ইবনু আসবাত বলেন, تخليصُ النِّيةِ مِنْ فسادِها أشدُّ على العاملينَ مِنْ طُولِ الاجتهاد ‘নিয়তকে তার গোলযোগ থেকে স্বচ্ছ রাখা দীর্ঘ পরিশ্রম করার চেয়েও অধিক কঠিন’।[১০] একদা সাহল ইবনু আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার উপর কোন বস্তু সর্বাপেক্ষা কঠিন? উত্তরে তিনি বলেন, ইখলাছ।[১১] এ কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেশী বেশী নিম্নোক্ত দো‘আটি পাঠ করতেন- يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ‘হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আপনি আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর অটল রাখুন’।[১২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শপথের সময়েও এ দো‘আটি পাঠ করতেন, لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ ‘(এর বিপরীত) নয়, অন্তরের পরিবর্তনকারীর কসম’।[১৩]

ইখলাছের পুরস্কার

১. জান্নাতুন নাঈম লাভ :

আল্লাহপাক তাঁর মুখলেছ বান্দার জন্য অনেক পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তার মধ্যে সর্বোত্তম পুরস্কার হল জান্নাতুন নাঈম। মহান আল্লাহ বলেন, إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ– فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ– فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ– عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ‘তবে তারা নয় যারা আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দা। তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিযিক। ফল-মূল; আর তারা হবে সম্মানিত সুখ-কাননে’ *(ছাফ্ফাত ৩৭/ ৪০-৪৩)*।

২. আমলের গ্রহণযোগ্যতা :

ইখলাছ হচ্ছে আমল কবুলের অন্যতম শর্ত। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আল্লাহ কোন আমল গ্রহণ করেন না দু’টি রুকন ব্যতীত। যথা- (১) শরী‘আতের পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া (২) শিরক মুক্ত।[১৪] আজী বলেন, ইলম পূর্ণতা লাভ করে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যর মাধ্যমে। যথা- (১) আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান (২) প্রকৃত শিক্ষা

৮. আল-জামে লিআখলাক্ব আর-রাবী ওয়া আদাব আস-সামে‘ ১/৩১৭।
৯. ইবনু রজব, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৮৪ পৃঃ।
১০. ঐ, ১/৮৪ পৃঃ ।
১১. ইবনুল ক্বাইয়িম, আর-রূহ, পৃঃ ৩৯২ ।
১২. তিরমিযী হা/২১৪০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৯১, হাসান।
১৩. বুখারী হা/৬৬১৭।
১৪. তাফসীর ইবনু কাছীর ৩/৪০৩ পৃঃ।

(৩) একমাত্র আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠ আমল (৪) সুন্নাতী পদ্ধতিতে আমল করা এবং (৫) হালাল রিযিক ভক্ষণ করা। এগুলোর কোন একটি না থাকলে আমল গৃহীত হবে না।[১৫] অন্যত্র তিনি বলেন,

إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ .

'ক্বিয়ামতের দিন, যে দিনের আগমনে কোন সন্দেহ নেই, সেদিন আল্লাহ যখন পূর্বাপর সকলকে একত্র করবেন, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে গিয়ে এর মধ্যে কাউকে শরীক করেছে, সে যেন গাইরুল্লাহ্র নিকট নিজের ছওয়াব চেয়ে নেয়। কেননা আল্লাহ শরীকদের শিরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত'।[১৬]

৩. আখিরাতে রাসূলের শাফা'আত লাভ :

বান্দার ইখলাছ যত বেশী হবে সে ক্বিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা'আতের দ্বারা ততবেশী সফলকাম হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি, যে একনিষ্ঠচিত্তে বলে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই'।[১৭] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) এ হাদীছ সম্পর্কে বলেন, 'তাওহীদের রহস্য হল শুধুমাত্র তাওহীদের মাধ্যমে শাফা'আত পাওয়া যাবে। অতএব যে ব্যক্তি তাওহীদের দিক থেকে বেশী পরিপূর্ণতা লাভ করবে সেই শাফা'আতের অধিক উপযোগী হবে। অতঃপর তিনি বলেন, শাফা'আত হল আহলে ইখলাছদের জন্য, আল্লাহ্র সাথে শিরককারীদের জন্য নয়'।[১৮]

৪. অন্তর বিদ্বেষ মুক্ত হয় :

যে সময় কোন অন্তরে ইখলাছের আগমন ঘটে তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করে, বিপদ থেকে রক্ষা করে, খারাপ গুণ ও অশ্লীলতা থেকে সুরক্ষা করে। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জে বলেন,

ثَلاَثٌ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنُّصْحُ لأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ

'এমন তিনটি বিষয় রয়েছে, যেগুলো মুমিন ব্যক্তির অন্তর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবে না। ১. আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠ আমল ২. মুসলিম জাতির জন্য কল্যাণ কামনা করা ও ৩. মুসলিম জাতির জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা'।[১৯]

৫. পাপরাশি মার্জনা ও দ্বিগুণ প্রতিদান :

যখন কোন ব্যক্তি ইখলাছযুক্ত আমল করতে সক্ষম হবে, তখন এটি তার জন্য গুনাহ মাফের এবং দ্বিগুণ প্রতিদানের মাধ্যম হবে। যদিও আনুগত্য বাহ্যিকভাবে অল্প বা কম মনে হয়। এ বিষয়ে ইবনুল মুবারক বলেন, رب عمل صغير تكثره النية ورب عمل كثير تصغره النية 'অনেক ছোট আমলকে নিয়ত বৃদ্ধি করে দেয়। আর অনেক বেশী আমলকে নিয়ত কম করে দেয়'।[২০]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'মানুষ কখনো একই প্রকার আমল করে সেটা এমনভাবে করে যে তার আমলের মধ্যে তার ইখলাছটা শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য পরিপূর্ণভাবে রূপ পায়। অতঃপর আল্লাহপাক এর বিনিময়ে কাবীরা গুণাহ ক্ষমা করে দেন'। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টির সামনে আমার এক উম্মতকে ডাকা হবে। অতঃপর তার সামনে নিরানব্বইটি দফতর পেশ করা হবে। প্রতিটি দফতর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। মহান আল্লাহ বলেন, তুমি কী এর কোন কিছু অস্বীকার কর? সে বলবে, না, হে আমার প্রভু! আল্লাহ বলবেন, তোমার উপর আমলনামা লেখক আমার ফেরেশতাগণ কী যুলুম করেছে? অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার নিকট কোন নেকি আছে? সে ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং বলবে, না। তখন আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ, আমার নিকট তোমার কিছু নেকী জমা আছে। আজ তোমার উপর যুলুম করা হবে না। অতঃপর তার সামনে একটি চিরকুট তুলে ধরা হবে, যাতে লিপিবদ্ধ থাকবে, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল'। আল্লাহ বলবেন, তুমি তোমার (আমলনামা ওযনের সময়) উপস্থিত থাক। সে বলবে, হে আমার রব! এত বৃহৎ দফতর সমূহের তুলনায় এই ক্ষুদ্র চিরকুট আর কী উপকারে আসবে! তিনি বলবেন, তোমার প্রতি অন্যায় করা হবে না। অতঃপর সেই বৃহদাকার দফতর সমূহ এক পাল্লায় এবং সেই ক্ষুদ্র চিরকুটটি আর এক পাল্লায় রাখা হবে। এতে বৃহদাকার দফতর সমূহের পাল্লা হালকা হয়ে উপরে উঠে যাবে এবং ক্ষুদ্র চিরকুটের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে।[২১]

হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ফযীলত ঐ ব্যক্তির জন্য, যে কালেমা শাহাদত ইখলাছের সাথে বলবে। তবে কাবীরা গুণাহগাররা যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে তারাও তো لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ বলত। কিন্তু তাদের বলাটা তাদের গুণাহ্র চেয়ে ভারী হবে না। যেমনটি لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ -এর কথকের কার্ডটি ভারী হয়েছিল।

অতঃপর তিনি ব্যভিচারীর হাদীছ উল্লেখ করেন যে, কুকুরকে পানি পান করিয়েছিল, অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ঐ ব্যক্তির ঘটনা, যে ব্যক্তি রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেছেন। তিনি এভাবে বলেন যে, এই মহিলাটি কুকুরকে পানি পান করিয়েছিলেন সাথে তার অন্তরে খালেছ ঈমান ছিল অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। নচেৎ আল্লাহ কী প্রত্যেক ব্যভিচারী, যে কুকুরকে পানি পান করাবে আর তাকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন? অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়েছিল সেও খালেছ ঈমানের সাথে করেছিল, বিধায় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।

---

১৫. আল-জামে লি আহকামিল কুরআন ২/২০৮ পৃঃ।
১৬. ইবনু মাজাহ হা/৪২০৩, সনদ ছহীহ।
১৭. বুখারী হা/৯৯।
১৮. তা'লীকাত ইবনুল ক্বাইয়িম- সুনান আবুদাঊদ ৭/১৩৪ পৃঃ।
১৯. ইবনু মাজাহ হা/২৩০, সনদ ছহীহ।
২০. সিয়ারু 'আলামিন নুবালা ৮/৪০০ পৃঃ।
২১. তিরমিযী হা/২৬৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০০; মিশকাত হা/৫৫৫৯, সনদ ছহীহ।

অতএব আমল শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে অন্তরের ঈমান ও ইখলাছের ভিত্তিতে; যেমনভাবে দু'জন ব্যক্তি একই কাতারে ছালাত আদায় করে কিন্তু তাদের ছাওয়াবের ব্যবধান হল আসমান-যমীনের ন্যায়। সুতরাং যারা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরাবে তাদের প্রত্যেকেই ক্ষমা করা হবে না।[২২]

অপরপক্ষে বান্দা কোন কাজ ইখলাছমুক্ত অবস্থায় করলে তার জন্য কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ 'তোমরা আলেমদের উপর বাহাদুরী প্রকাশের জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য এবং জনসভার উপর বড়ত্ব প্রকাশের জন্য ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা কর না। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, তার জন্য রয়েছে আগুন আর আগুন।[২৩]

৬. সহায়তা ও দৃঢ়তা লাভ :

ঈমানদারগণ তাদের আমলগুলো ইখলাছের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে থাকে। ফলে তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَشِّرْ هَذِهِ الأُمَّةَ بِالنَّصْرِ وَالسَّنَاءِ وَالتَّمْكِينِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الآخِرَةِ نَصِيبٌ.

উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'এই উম্মতকে সাহায্য, উচ্চমর্যাদা ও শক্তি দিয়ে বিজয় দান করার সুসংবাদ প্রদান কর। তবে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য আখেরাতের আমল করবে তার জন্য আখেরাতে কোন কল্যাণকর অংশ থাকবে না।[২৪]

সুধী পাঠক! আমরা যদি সালাফে ছালেহীনদের জীবনী একটু ভেবে দেখি তাহলে সহজেই বুঝতে পারব যে, তারা শুধুমাত্র তাদের ঈমানী শক্তি, আত্মপরিশুদ্ধি ও অন্তরের ইখলাছের বিনিময়ে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছিলন।

এ প্রসঙ্গে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, فَمَنْ خَلُصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ كَانَ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ 'হক্বের ক্ষেত্রে যার নিয়ত নির্ভেজাল হয়, যদিও স্বয়ং তার মনের বিপক্ষে হয়, তাহলে তার মাঝে এবং মানুষের মাঝে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়'।[২৫]

৭. ইহকালে মানুষের ভালবাসা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন :

আল্লাহ তা'আলা মুখলিছ ব্যক্তির জন্য সৃষ্টির অন্তরে ভালবাসা ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দেন। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি রিয়া প্রদর্শন করে প্রসিদ্ধ এবং মর্যাদা অর্জন করতে চায় আল্লাহ তার উদ্দেশ্য ভণ্ডুল করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ 'যে ব্যক্তি লোক শোনানো ইবাদত করে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার লোক শোনানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানো ইবাদত করবে আল্লাহ তার বিনিময়ে তার লোক দেখানো উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দিবেন'।[২৬] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ 'পার্থিব চিন্তা যাকে মোহগ্রস্ত করবে, আল্লাহ তা'আলা তার কাজকর্মে অস্থিরতা সৃষ্টি করবেন, দারিদ্রতা তার নিত্য সঙ্গী হবে এবং পার্থিব স্বার্থ ততটুকুই লাভ করতে পারবে, যতটুকু তার তাক্বদীরে লিপিবদ্ধ আছে। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখেরাত, আল্লাহ তার সব কিছু সুষ্ঠু করে দিবেন, তার অন্তরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করবেন এবং দুনিয়া স্বয়ং তার সামনে এসে হাযির হবে'।[২৭]

৮. মুবাহ কর্ম মহৎ-এ রূপান্তর :

বান্দার যাবতীয় কর্ম বিশুদ্ধ ও সৎ নিয়তের ভিত্তিতে সংঘটিত হলে তা গৃহীত হিসাবে গণ্য হয়। হাদীছে এসেছে,

'তোমাদের স্ত্রী মিলনেও রয়েছে ছাদাক্বার ছাওয়াব। (ছাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের কেউ তার প্রবৃত্তি কামনা পূর্ণ করবে আর তাতে তার ছাওয়াব হবে? রাসূল (সঃ) বললেন, তোমরা কি মনে কর, যদি সে তার প্রবৃত্তি কামনা হারাম (যেনার) কাজে ব্যবহার করত, তাহলে কি সে ক্ষেত্রে পাপ হত না? অনুরূপভাবে যখন সে তার প্রবৃত্তি কামনা হালাল (স্ত্রীর সাথে) পথে ব্যবহার করবে তখন তার ছাওয়াব হবে'।[২৮]

তিনি আরো বলেন, إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ 'তুমি আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা-ই ব্যয় কর না কেন, তোমাকে তার প্রতিদান নিশ্চিতরূপে প্রদান করা হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও (প্রতিদান পাবে)'।[২৯]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, যখন মুবাহ আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, তখন সে আমল মহৎ কর্মে পরিণত হয় এবং তার প্রতিদান দেওয়া হয়। আর রাসূল (ছাঃ) তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে সতর্ক করেছেন যে, حَتَّى اللُّقْمَةِ تَجْعَلُهَا فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ 'কেননা স্ত্রী দুনিয়াবী বস্তুগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। যখন সে তার স্ত্রীর মুখে গ্রাস তুলে দেওয়ার বিনিময়ে আল্লাহ তাকে ছাওয়াব দেন'। আর এমন প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয় স্ত্রীর সাথে বিনোদনের সময়ে; অথচ এই সময়টি পরকালের আমল থেকে অনেক দূরের ব্যাপার। তদপুরি আল্লাহ পাক সে আমলে ইখলাছ থাকার কারণে ছাওয়াব দান করেন। তাহলে অন্য আমলের ক্ষেত্রে ইখলাছের বিনিময়ে আল্লাহ কতগুণ ছাওয়াব দান করেন? যা সহজে বোধগম্য। এই কারণে সালাফগণ প্রত্যেক মুবাহ কাজে সৎ নিয়ত করতেন, যাতে তাদের কোন আমল ছাওয়াব মুক্ত না হয়। কেননা বান্দার নিয়ত সৎ ও স্বচ্ছ হলে আল্লাহ তাকে প্রতিদান দেন যদিও একটি গ্রাসের বিনিময়ে হয়। যেমনভাবে ইখলাছ মুবাহ আমলকে মহৎ আমলে উন্নীত করে। পক্ষান্তরে রিয়া (লোক দেখান) আমল, মহৎ আমলকে জঘন্য গুনাহে রূপান্তর করে ফেলে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا

২২. মিনহাজুস সুন্নাহ ৬/২১৮-২২২ পৃঃ।
২৩. ইবনু মাজাহ হা/২৫৪, সনদ ছহীহ।
২৪. মুসনাদে আহমাদ হা/২১২৬১, সনদ হাসান ছহীহ।
২৫. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২১০৪২।
২৬. বুখারী হা/৬৪৯৯।
২৭. ইবনু মাজাহ হা/৪১০৫, সনদ সহীহ।
২৮. মুসলিম হা/১০০৬।
২৯. বুখারী হা/৫৬।

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ‘হে বিশ্বাসীগণ! দানের কথা বলে বেড়ায়ো না এবং ক্লেশ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিস্ফল করো না, যে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না’ *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*।

৯. সৎ নিয়ত আমলের সমপরিমাণ :

কখনো সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থসংকট বা অসুস্থতার কারণে সে সৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে অক্ষম হয়। কখনো কল্যাণকর কাজ করতে প্রচেষ্টা করে; কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ তা‘আলা তার অন্তরের ইখলাছের ফলে ঐ কর্মে তাকে পুরোপুরি প্রতিদান দিয়ে থাকেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ ‘কিছু ব্যক্তি মদীনায় আমাদের পিছনে রয়েছে। আমরা কোনো ঘাঁটি বা উপত্যকায় চলিনি, তাদের সঙ্গে ব্যতীত। ওযর-ই তাদের বাধা দিয়েছে’[৩০] এবং إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ ‘তবে তারা তোমাদের সাথে ছাওয়াবে শামিল হয়েছে’।[৩১] তিনি আরো বলেন, مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‘যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের ছালাত পড়ার নিয়ত করে ঘুমাতে যায়

কিন্তু তার চক্ষুদ্বয় ঘুমে বিভোর হয়; এমনকি সে সকাল করল, তার জন্য তাই লেখা হবে যা সে নিয়ত করে। আর তার এই ঘুম-ই হবে আল্লাহ্র পক্ষ হতে ছাদাক্বা’।[৩২] তিনি আরো বলেন, مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ‘যে সততার সাথে শহীদ হওয়ার কামনা করে আল্লাহ তাকে শহীদী মর্যাদা দান করেন যদিও সে আপন বিছানায় মৃত্যুবরণ করে’।[৩৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً ‘যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের নিয়ত করল কিন্তু সে তা পালন করল না, তবুও তার জন্য একটি ছওয়াব লেখা হয়’।[৩৪]

মুখলিছ ব্যক্তির কাজটি যদি যথাস্থানে নাও পৌঁছে, তবুও মহান আল্লাহ তাকে পূর্ণ ছাওয়াব দান করেন। শুধুমাত্র তার ইখলাছের বিশুদ্ধতার বিনিময়ে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

‘এক ব্যক্তি বলল, আমি কিছু ছাদাক্বা করব। ছাদাক্বা নিয়ে বের হয়ে (ভুলে) সে এক চোরের হাতে তা দিয়ে দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, চোরকে ছাদাক্বা দেওয়া হয়েছে। এতে সে বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, আমি অবশ্যই ছাদাক্বা করব। ছাদাক্বা নিয়ে বের হয়ে তা এক ব্যভিচারিনীর হাতে দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, রাতে এক ব্যভিচারিনীকে ছাদাক্বা দেওয়া হয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, (আমার ছাদাক্বা) ব্যভিচারিনীর হাতে পৌঁছল! আমি অবশ্যই ছাদাক্বা করব। এরপর সে ছাদাক্বা নিয়ে বের হয়ে কোন এক ধনী ব্যক্তির হাতে দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, ধনী ব্যক্তিকে ছাদাক্বা দেওয়া হয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, (আমার ছাদাক্বা) চোর, ব্যভিচারিনী ও ধনী ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়ল! পরে স্বপ্নযোগে বলা হল, তোমার ছাদাক্বা ব্যভিচারিনী পেয়েছে, সম্ভবতঃ সে তার ব্যভিচার হতে পবিত্র থাকবে, ধনী ব্যক্তি তোমার ছাদাক্বা পেয়েছে, সম্ভবতঃ সে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ্র দেওয়া সম্পদ হতে ছাদাক্বা করবে, আর তোমার ছাদাক্বা চোর পেয়েছে, সম্ভবতঃ সে চুরি করা থেকে বিরত থাকবে’।[৩৫]

১০. বিপদ থেকে মুক্তিলাভ :

সৎ থাকার কারণে আল্লাহ দুনিয়ার বালা-মুছীবত থেকে রক্ষা করেন এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. ‘তাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল’ *(ছাফ্ফাত ৩৭/৭১)*। আল্লাহ আরো বলেন,

‘তিনি তোমাদেরকে জল-স্থলে ভ্রমণ করান এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং এগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, অতঃপর এগুলো ব্যাহত এবং সর্বদিক হতে তরঙ্গায়িত হয় এবং তারা তার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে মনে করে, তখন তারা আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে আল্লাহকে ডেকে বলে, তুমি আমাদেরকে ইহা হতে পরিত্রাণ দিলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর তিনি যখনই তাদেরকে বিপদ-মুক্ত করেন তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে যুলুম করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের যুলুম বস্তুতঃ তোমদের নিজেদের প্রতিই হয়ে থাকে; পার্থিব জীবনে সুখ ভোগ করে নাও, পরে আমারই নিকটে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। যখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব তোমরা যা করতে’ *(ইউনুস ১০/২২-২৩)*।

আল্লাহ বলেন, وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ‘যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘাচ্ছন্নের মত, তখন তারা আল্লাহকে ডাকে তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে; কেবল বিশ্বাঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নির্দেশাবলীই অস্বীকার করে’ *(লুকমান ৩১/৩২)*। এ সম্পর্কে একটি হাদীছের সার-সংক্ষেপ করা তুলে ধরা হল-

‘বিপদের সময় তিনজন ব্যক্তি গুহায় আশ্রয় নিলে তাদের সে গুহাটির প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর তারা পর্যায়ক্রমে

৩০. বুখারী হা/২৮৩৯ ।
৩১. মুসলিম হা/১৯১১।
৩২. নাসাঈ হা/১৭৮৭; ছহীহ তারগীব হা/২১, সনদ হাসান ছহীহ।
৩৩. মুসলিম হা/১৯০৯।
৩৪. মুসলিম হা/৩৫৪ ।
৩৫. বুখারী হা/১৪২১।

Contents

তাদের জীবনের সৎ আমলের কথা স্মরণ করে এবং শেষে বলে, হে আল্লাহ! সে আমলটি যদি আপনার মনতুষ্টির জন্য করে থাকি তাহলে আপনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাদেরকে সেই মহাবিপদ থেকে রক্ষা করেন এবং সেখান থেকে তারা মুক্তি পায়'।[৩৬] সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর বরাতে মক্কা বিজয়ের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, 'ইকরিমা সমুদ্রে আরোহণ করে একপর্যায়ে তাদের নৌকাটি বিপদের কবলে পড়লে ইকরিমা তখন বলেন, হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাদের এই বিপদ থেকে নিরাপত্তা দান করেন তাহলে আমি মুহাম্মাদের ধর্মের প্রতি ঈমান আনব। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন'।[৩৭]

১১. শয়তানের প্রতারণা থেকে সুরক্ষা :

শয়তান সর্বদা মানুষকে ধোকায় ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে এবং খারাপ আমলগুলো তার জন্য জাকজমক করে তুলে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর মুখলিছ বান্দাদেরকে তার চক্রান্ত থেকে হেফাযত করেন। আল্লাহ বলেন, قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ- إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 'সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন তার জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে অবশ্যই শোভন করে তুলব এবং আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করব, তবে তাদের মধ্যে আপনার নির্বাচিত বান্দাগণ ব্যতীত' *(হিজর ১৫/৩৯-৪০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ- إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 'সে বলল, 'আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদেরকে সকলকেই পথভ্রষ্ট করব, তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়' *(ছোয়াদ ৩৮/৮২-৮৩)*।

আবু সুলায়মান আদ-দায়ানী বলেন, إذا أخلص العبد انقطعت عن الوساوس والرياء 'বান্দা যখন তার আমলে ইখলাছ করে তখন তার থেকে কুমন্ত্রণা ও রিয়া দূরীভূত হয়ে যায়'।[৩৮]

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, যখন কেউ তার রবের জন্য ইখলাছ করে তখন তার রব তাকে পসন্দ করেন। অতঃপর তার অন্তর পুনরুজ্জীবিত করেন। সে তার রবের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং তার থেকে সব ধরনের অন্যায় অশ্লীলতা ফিরিয়ে দেন। এই অন্তরটি ঐ অন্তরের বিপরীত যে অন্তরে আল্লাহ্‌র ইখলাছ নেই। সেটি শুধু (দুনিয়ার) সন্ধানে এবং সাধারণ ভালবাসায় লিপ্ত থাকে। কখনো হারামের দিকে ধাবিত হয়। সে শুধু তার মনের পূজা করে, যার ফলে সে মানুষের নিকট শত্রু এবং সমালোচনার পাত্র হয়ে পড়ে।

১২. কল্যাণ, ভদ্রতা এবং শান্তি অর্জন :

যখন বান্দা তার প্রভুর জন্য তার আমলে ইখলাছ করে তখন তাকে সত্যের সন্ধান দান করে। সাথে সাথে তাকে ভাণ্ডার দান করা হয় এবং তার আমলে বরকত দান করা হয়। হাকিম বলেন, ما أخلص عبد قط أربعين يوما إلا ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه 'কোন বান্দা যদি ৪০দিন আল্লাহ্‌র জন্য ইখলাছ করে তাহলে তার অন্তর থেকে জিহ্বায় হিকমাহ্‌র ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে'।[৩৯]

১৩. ফিতনা থেকে মুক্তি লাভ :

আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ 'সেই রমণী তো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। আমি তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত' *(ইউসুফ ১২/২৪)*।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ ইউসুফ (আঃ)-কে অশ্লীলতা এবং বেহায়াপনা থেকে রক্ষা করেছেন তার ইখলাছের বিনিময়ে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসে এবং তাঁর জন্যই একনিষ্ঠতা প্রকাশ করে সে ব্যক্তির অন্তরটা তার প্রেমিক আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য ইখলাছ করে না সে ব্যক্তি অন্তর অন্যের ইবাদত করে'।[৪০] ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, গুনাহের মূলনীতি ৩টি। যথা : (১) অন্তরের ধ্যান আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাথে থাকা। (২) কোন ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কাজ করা ও (৩) কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ। এগুলোর আসল রূপ হল শিরক, যুলুম, অশ্লীলতা। এ তিনটি একটি অপরটির দিকে আহ্বান করে। যেমন শিরক আহ্বান করে যুলুম ও অশ্লীলতার দিকে। এর বিপক্ষে ইখলাছ এবং তাওহীদ তা প্রতিহত করে। আল্লাহ বলেন, كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ 'আমি তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত' *(ইউসুফ ১২/২৪)*। *(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)*

[লেখক : ছাত্র, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব]

৩৬. বুখারী হা/২২৭২; মুসলিম হা/২৭৪৩।
৩৭. নাসাঈ হা/৪৬৭, সনদ ছহীহ।
৩৮. সিয়ারু 'আলামিন নুবালা ৯/৩৪১ পৃঃ।
৩৯. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন ২/৯২ পৃঃ।
৪০. ইগাছাহ ১/৪৭ পৃঃ।

Gm G j vBeªix

এখানে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত ও অন্যান্য আহলেহাদীছ লেখকদের রচিত ইসলামী বই, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক, সোনামণি প্রতিভা, সিডি, ডিভিডি ও শিক্ষা সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

we: `ª: wfwm †hvMeB †cÖÿKi vnq|

যোগাযোগ : এস. এ. লাইব্রেরী
জামতৈল পূর্ব বাজার (কড়িতলা মার্কেট), কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।
মোবা : ০১৭৭৬-৯৫৯৮৯৬, ০১৬৭৬-১৪৪৪০৩

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

বযলুর রহমান

ভূমিকা :

আদর্শ পরিবার গঠন ও বংশবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে পিতা-মাতার হৃদয় জুড়ে পৃথিবীতে একটি শিশু আগমন করে। সদ্য প্রসূত সন্তানকে ঘিরে শুরু হয় বাহারী রকমের আয়োজন। চৈতন্য জগতে জমা হয় নানা রকম পরিকল্পনা। মনের গহীনে লুক্কায়িত থাকা সমস্ত ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে অত্যন্ত আনন্দচিত্তে। পিতা-মাতার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রস্ফুটিত হয় রকমারি স্বপ্ন। একসময় ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বপ্ন বাস্তবায়নের দুনিয়াবী লড়াইয়ে। সন্তান হয় 'শৈশব স্কুল' তথা পরিবারের প্রদেয় শিক্ষা মোতাবেক গঠিত এক যোগ্য উত্তরসূরী। এক পর্যায়ে 'পারিবারিক শিক্ষা কর্মসূচী' বাস্তবে রূপায়িত হতে শুরু হয়। তাই পরিবারের শিক্ষা যদি সুষ্ঠু, স্থায়ী পরিকল্পনা ও ইসলামের বিশুদ্ধ আদর্শভিত্তিক হয়, তাহলে জীবন হবে সুষোভামণ্ডিত। অন্যদিকে পারিবারিক শিক্ষা যদি পরিকল্পনাহীন, আদর্শহীন, গতানুগতিক ও প্রগতির ধারায় হয়, তাহলে জীবন নিক্ষিপ্ত হবে আস্তাকুঁড়ে।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ জীবিত থাকাকালীন তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ মৃত্যু পরবর্তী সময়ে তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(ক) জীবিত থাকাকালীন তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য :

প্রথমতঃ পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হল তার সবচেয়ে ভাল ও উত্তম ব্যবহার শুধুমাত্র তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা। সদাচরণের ভিত্তি স্থাপিত হয় পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিদের মাঝে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। তারা তাদের সন্তানদের এই মর্মে শিক্ষা প্রদান করবে যে, সন্তানের পক্ষ থেকে সকল প্রকারের সদাচরণ প্রাপ্তির অধিকারী একমাত্র তারাই। ইসলামে আল্লাহ্র ইবাদত করার পরই যে উত্তম কাজটি সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে সেটি হল পিতা-মাতার সাথে ইহসান বা উত্তম ব্যবহার করা। মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে' *(নিসা ৪/৩৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا , وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

'তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের সাথে বিরক্তি সূচক কিছু কথা বল না এবং ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বল। রহমদিলে তাদের সাথে সর্বদা বিনয়াবনত থাক এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৩-২৪)*।

উপরোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বিশ্ব জাহানের একক রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ ইবাদতের পর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা সর্বাধিক উত্তম কাজ। বিশেষ করে তারা উভয় অথবা তাদের কেউ যখন বার্ধক্যে উপনীত হবে তখন তাদের সাথে ধমকের সুরে বা বিরক্তবোধের সাথে কথাও বলা যাবে না। সর্বদা নম্রতার সাথে বিনয়াবনত চিত্তে ইহসান ব্যবহার করতে হবে। যদিও তারা অমুসলিম হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عَنْ أَبِيْهِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ : نَزَلَتْ فِيْ أَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى كَانَتْ أُمِّيْ حَلَفَتْ أَنَّ لَا تَأْكُلَ وَلَا تَشْرَبَ حَتَّى أُفَارِقُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَالثَّانِيَةُ إِنِّيْ كُنْتُ أَخَذْتُ سَيْفًا أَعْجَبَنِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَبْ لِيْ هَذَا فَنَزَلَتْ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ وَالثَّالِثَةُ إِنِّيْ مَرِضْتُ فَأَتَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَن أَقْسِمَ مَالِيْ أَفَأُوْصِيْ بِالنِّصْفِ؟ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ الثُّلُثُ؟ فَسَكَتَ فَكَانَ الثُّلُثُ بَعْدَهُ جَائِزًا وَالرَّابِعَةُ إِنِّيْ شَرِبْتُ الْخَمْرَ مَعَ قَوْمٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ أَنْفِيْ بِلِحْيِ جَمَلٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَحْرِيْمَ الْخَمْرِ.

সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, আমাকে উপলক্ষ্য করে পবিত্র কুরআনে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। প্রথমত : আমার মাতা শপথ করেছিলেন যে, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সঙ্গ ত্যাগ না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পানাহার করবেন না। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন, 'তারা (পিতা-মাতা) যদি আমার সাথে শরীক করতে তোমাকে চাপ দেয় যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি (এ ব্যাপারে) তাদের আনুগত্য করবে না। তবে পার্থিব ব্যাপারসমূহে তাদের সাথে সৌজন্য রক্ষা করে চলবে' *(লোকমান ৩১/১৫)*। দ্বিতীয়ত : আমি একদা (যুদ্ধলব্দ দ্রব্য সম্ভারের) একটি তরবারি পাই, যা আমার পছন্দ হয়। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এটি আমাকে দান করুন। তখন আয়াত নাযিল হয়, 'লোকেরা আপনার নিকট যুদ্ধলব্দ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে' *(আনফাল ৮/১)*। তৃতীয়ত : একদা আমি অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে দেখতে আসেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি আমার সম্পদ বণ্টন করে দিতে চাই। আমি কি আমার সম্পত্তির অর্ধেকাংশ অছিয়াত করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। অতঃপর পুনরায় বললাম, তাহলে এক তৃতীয়াংশ? তখন তিনি চুপ থাকলেন এবং এটাই শেষ পর্যন্ত মূলনীতি হিসাবে সাব্যস্ত হয়। চতুর্থত : একদা আমি আনছার গোত্রের কতিপয় ছাহাবীর (তখনও মদ হারাম হয়নি)

সাথে মদ পান করি। তাদের মধ্যে একটি লোক (মাতাল অবস্থায়) উঠের চোয়ালের হাড় দ্বারা আমার নাকে প্রহার করে। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হই। অতঃপর মদ হারাম সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হয়।[৪১] অন্যত্র তিনি বলেন,

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ أَتَتْنِيْ أُمِّيْ رَاغِبَةٌ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَفَأَصِلُهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ بْنُ عُيَيْنَةَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا لَا يَنْهَاكُمْ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْ الدِّيْنِ.

আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে আমার (মুশরিক) মাতা (ইসলামের) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আমার নিকটে আসলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কী তার সাথে উত্তম ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইবনু উয়াইনাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আয়াত নাযিল হয়, 'যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হয় না তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না' *(মুমতাহানাহ ৬০/৮)*।[৪২]

উপরোক্ত দু'টি হাদীছে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র নাফরমানিমূলক কাজে পিতা-মাতার আনুগত্য করা নিষিদ্ধ। এতদসত্ত্বেও দুনিয়াবী অন্যান্য বিষয়ে তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করতে হবে। তাদের সাথে কোনরূপ বেয়াদবি বা খারাপ আচরণ করা যাবে না। বরং পরম যত্ন সহকারে আজীবন তাদের ভরণপোষণ ও সেবাশুশ্রূষা করে যেতে হবে। অথচ আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে নিজের গর্ভধারিনী মা ও বাবা সন্তানের ভালবাসার ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত। বৃদ্ধাবস্থায় তাদের আশ্রয় হয় বৃদ্ধাশ্রমে। অথচ ইসলাম দেড় হাযার বছর পূর্বেই পিতা-মাতার অধিকার ন্যায়ানুগভাবে প্রদান করেছে। সভ্যতাগর্বী বর্তমান Most etiquette Society বা সুসভ্য সমাজের জনগণের এ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

দ্বিতীয়ত : আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল

পৃথিবীতে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের নিরঙ্কুশ তাওহীদের ঘোষণা দেওয়ার পরই পিতা-মাতার সাথে সর্বোৎকৃষ্ট আচরণের কথা বলা হয়েছে। মানব জীবনের সার্বিক উন্নতি ও সফলতার নেপথ্যে আল্লাহ তা'আলাকে নিরঙ্কুশ আনুগত্য ও পিতা-মাতার সৎ কাজের আনুগত্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। মানুষের সৃষ্টিকর্তা হলেন মহান আল্লাহ। আর পিতা-মাতা কঠিন যাতনা সহ্য করে ও শত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও একটি শিশুকে সুশিক্ষা ও সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করে গড়ে তোলেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমলসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রিয় আমল।

أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِىَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ حَدَّثَنِى بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِى.

আবু 'আমর শায়বানীকে আমি বলতে শুনেছি যে, এই বাড়ির মালিক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন বলে তিনি আব্দুল্লাহ্র বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন, যথাসময়ে ছালাত আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। পুনরায় আমি বললাম, তরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। রাবী বলেন, আমাকে এইসব বর্ণনা করলেন। যদি আমি আরো অধিক জিজ্ঞাসা করতাম, তাহলে তিনি আরো অধিক বর্ণনা করতেন।[৪৩]

অন্যদিকে পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি নিহিত।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ.

আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, পিতা-মাতার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি নিহিত।[৪৪]

তৃতীয়ত : পিতা-মাতা হলেন সর্বাধিক সদ্ব্যবহারের পাওয়ার যোগ্য

বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক সদ্ব্যবহার ও সুন্দরতম আচরণ পাওয়ার একমাত্র হক্বদার হলেন পিতা-মাতা। এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। কেননা পৃথিবীতে আগমন করে নির্মল আলো-বাতাস গ্রহণ ও স্থিতি দান কেবলমাত্র আল্লাহ্র রহমতে তাদের মাধ্যমেই সম্ভব। এক্ষেত্রে মাতার ভূমিকা অগ্রগণ্য। সন্তানকে ঘিরে মাতার অকৃত্রিম ভালোবাসা ও দুর্লভ ত্যাগ বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। এমনকি মহানবী (ছাঃ) পিতার চেয়ে মাতার মর্যাদা প্রদান করেছেন। যদিও পিতারও অনেক অবদান রয়েছে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসল। অতঃপর বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশী হক্বদার কে? রাসূলুল্লহ (ছাঃ) বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি আবার বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি পুনরায় বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি পুনরায় বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতার।[৪৫]

---

৪১. মুসলিম হা/৬৩৯১; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৪, হাদীছ ছহীহ।
৪২. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৫, সনদ ছহীহ।
৪৩. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১; বুখারী হা/৫২৭, ৫৯৭০; নাসাঈ হা/৬১০; মুসনাদে আহমাদ হা/৩৯৬৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৮৯; সনদ ছহীহ।
৪৪. তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২; হাকিম হা/৭২৪৯; ইবনু হিব্বান হা/৪২৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫১৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৫০৬, সনদ ছহীহ।
৪৫. বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/৬৬৬৪ ও ৬৬৬৫; হাকেম হা/৭২৪২; আবুদাঊদ হা/৫১৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৫৮;

সুধী পাঠক! বর্তমান সমাজে এর বিপরীত অবস্থা বিরাজ করছে। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের পরিবর্তে স্বীয় স্ত্রীর মা শ্বাশুড়িকে আপন মা মনে করে সদ্ব্যবহার ও উত্তম আচরণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হচ্ছে। নিজের মাকে বাড়ির কাজের লোক বলে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। ভোগবাদিতার উচ্চমার্গ আরোহণ করে নিজের গর্ভধারিনী জননীকে বিশাল অট্টলিকায় ঠাঁয় না দিয়ে গোয়াল ঘরে থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বস্তাবন্দী করে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে। এহেন অবস্থায় দুঃখী মায়ের অন্তর হুঁ হুঁ করে ওঠে। হয়তো এ অবস্থায় আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। মা তখন নীবরে নিভৃতে চোখের পানি ফেলে। তখন মায়ের বুকফাঁটা আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠে। পরিশেষে সন্তানের পদস্খলন ঘঠে। যা পত্রিকান্তরে প্রকাশ। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে!

চতুর্থত : পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ কাবীরা গুনাহসমূহের অন্যতম

পৃথিবীতে যত কাবীরা গুনাহ রয়েছে তার মধ্যে পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ অন্যতম। কারণ সন্তানকে লালন-পালন করতে তারা কঠিন কষ্ট স্বীকার করে থাকে। হাযারো দুঃখ-বেদনা বুকে চেপে রেখে সুখে রাখতে চায় সন্তানকে। গ্রীষ্মের কঠিন দাপদাহ ও তীব্র কনকনে শীতের মধ্যেও তারা সন্তানকে আগলে রাখে সুখের নীড়ে স্নেহের আঁচল তলে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সন্তান যখন পরিণত বয়সে উপণীত হয়, তখন সে হয় অবাধ্য। ফলে তাদের ওপর শুরু হয় মানসিক, আর্থিক ও মাঝে মাঝে শারীরিক নির্যাতনের স্টিমরোলার। অক্ষম বৃদ্ধ পিতা-মাতা মুখ বুজে সহ্য করে চোখের পানি ফেলে। আর এজন্য মূলতঃ অসুস্থ পরিবেশ, নিকৃষ্ট সংঙ্গদোষ ও আপোসকামি মনোভাবই দায়ী। সন্তান-সন্ততিকে পিতা-মাতার এই অকৃত্রিম ভালবাসার ফলশ্রুতিতে তারা যদি সন্তান কর্তৃক অবাধ্যাচরণের স্বীকার হন তাহলে এর চেয়ে কষ্ট ও হৃদয়বিদারক ঘটনা আর কী হতে পারে! দীর্ঘ দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে এবং একাধারে আড়াই বছর দুধ পান করিয়ে সন্তানকে যে দৈহিক ও মানসিক শক্তিমত্তা সঞ্চার করেন তার ঋণ সন্তানের পক্ষ থেকে পরিশোধযোগ্য নয়। এজন্যই তাদের অবাধ্য হওয়া কাবীরা গুনাহ। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ.

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে কাবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা।[৪৬] অন্যত্র বলা হয়েছে, পিতা-মাতাকে কাঁদানো এবং তাদের অবাধ্যতাও কাবীরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত।[৪৭]

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। হাদীছে এসেছে, সাঈদ ইবনু আবু বুরদা (রহঃ) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, ইবনু ওমর (রাঃ) একদা জনৈক ইয়ামনী যুবককে স্বীয় মাতাকে পৃষ্ঠে আরোহণ করে ত্বাওয়াফরত অবস্থায় দেখতে পেলেন। সে তখন এরূপ কবিতা আবৃতি করছিল, 'আমি তার অনুগত উষ্ট্রের মত। যদি তার রেকাব (পা-দানী) দ্বারা আমি আঘাতপ্রাপ্ত হই, তবুও নিরুদ্বেগে তা সহ্য করে যাই'। তারপর সে বলল, আমি কি আমার মায়ের প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন? তিনি (ইবনু ওমর রাঃ) বললেন, না, তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও তো হয়নি। অতঃপর ইবনু ওমর (রাঃ) ত্বাওয়াফ করলেন এবং মাক্বামে ইবরাহীমে পৌঁছে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করলেন এবং বললেন, হে আবু মূসার পুত্র! প্রত্যেক দুই রাক'আত ছালাত পূর্ববর্তী পাপের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ।[৪৮] তবে আশার বাণী হল সন্তান যদি তাদেরকে ক্রীতদাস অবস্থায় পায় এবং তাকে খরিদ করে আযাদ করে দেয় তবে প্রতিদান হতে পারে।[৪৯] সুধী পাঠক! কোনভাবেই যদি পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ হয়ে যায়, তবে তা কাবীরা গুনাহ হিসাবে পরিগণিত হবে। আর কাবীরা গুনাহ খালেছ তওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না। অন্যদিকে বান্দার হক্ব বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন না। সুতরাং পিতা-মাতার অবাধ্যচারণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

পঞ্চমত : পিতা-মাতার খেদমত করা জিহাদ ও হিজরতের চেয়েও অগ্রগণ্য

পিতা-মাতাকে সঠিকভাবে দেখাশুনা বা একনিষ্ঠতার সাথে খেদমত করা জিহাদ করার সমতুল্য বা তার চেয়ে বেশী। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُجَاهِدُ قَالَ لَكَ أَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলল, আমি জিহাদে যাব আমাকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ, জীবিত আছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাদের ব্যাপারে জিহাদ করো অর্থাৎ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও উত্তম আচরণ কর। কেননা এটাই জিহাদ।[৫০]

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার হিজরতের চেয়ে অগ্রগণ্য। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَىَّ يَبْكِيَانِ فَقَالَ ارْجِعْ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا.

তিরমিযী হা/১৮৯৭; মুসনাদে আহমাদ হা/২০০৪০; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৩৪; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩ ও ৫; মিশকাত হা/৪৯১১ ও ৪৯২৯।

৪৬. বুখারী হা/২৬৫৩; মুসলিম হা/২৬৯; তিরমিযী হা/১২০৭; মিশকাত হা/৫০।

৪৭. بُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوْقِ وِالْكَبَائِرِ আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩১, ৮, সনদ ছহীহ।

৪৮. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১, সনদ ছহীহ।

৪৯. لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০, সনদ ছহীহ।

৫০. বুখারী হা/৫৯৭২ ও ৩০০৪; মুসলিম হা/৬৬৬৮; আবুদাঊদ হা/২৫২৯; তিরমিযী হা/১৬৭১; নাসাঈ হা/৩১০৩; মুসনাদে আহমাদ হা/৬৫৪৪; মিশকাত হা/৩৮১৭।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসল। অতঃপর বলল, আমি আপনার কাছে হিজরতের বায়'আত করার জন্য এসেছি এবং আমি আমার পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে এসেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও। তাদের উভয়কে যেভাবে কাঁদিয়েছ সেভাবেই হাসাও।[৫১] উল্লেখ্য যে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করলে আয়ু বৃদ্ধি পায় বলে আদাবুল মুফরাদে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।[৫২]

ষষ্ঠত : জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম

পিতা-মাতার খেদমত জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম। বৃদ্ধাবস্থায় পিতা-মাতার উভয়কে অথবা যে কোন একজনকে পেলে তার সাথে উত্তম আচরণ ও সুন্দর ব্যবহার করার কথা হাদীছ বলা হয়েছে, যার বিনিময় হল জান্নাত। এটা যদি কেউ না পারে তাহলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ভর্ৎসনা করেছেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ. قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তার নাক ধুলায় ধূসরিত হোক! তার নাক ধুলায় ধূসরিত হোক! তার নাক ধুলায় ধূসরিত হোক! ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, কার নাক হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, বৃদ্ধাবস্থায় যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা যে কোন একজনকে পেল, অথচ সে জান্নাতে যেতে পারল না।[৫৩]

عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئِ قَالَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَاحْفَظْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ دَعْهُ.

আবু আব্দুর রহমান আল-মুক্বরী (রাঃ) বলেন, আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, পিতা-মাতা হল জান্নাতের মধ্যম দরজা। সুতরাং তোমরা উক্ত দরজাকে (সদ্ব্যবহার দ্বারা) সংরক্ষণ কর অথবা (অসদ্ব্যবহার করে) ছেড়ে দাও।[৫৪]

সপ্তমত : পিতা-মাতাকে অভিশাপ ও গালিগালাজ না করা

পৃথিবীর বুকে পিতা-মাতা হল সন্তান-সন্ততির নিশ্চিন্ত আশ্রয় স্থল। যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট, রোগব্যাধি, বিপদ-আপদে সে পিতা-মাতাকে একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে মনে করে। তারাও তাকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করে থাকে। সুতরাং এই নিরাপদ আশ্রয়ের পাদপীঠকে কেউ যদি লাঞ্ছিত করে, বিভিন্ন রকমের অভিশাপ প্রদান করে তাহলে তার উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত অবতীর্ণ হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَىْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَىْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلاَّ مَا كَانَ فِى قِرَابِ سَيْفِى هَذَا قَالَ فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا.

আবু ত্বোফাইল বলেন, একদা আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, নবী করীম (ছাঃ) আপনাদের কী এমন কোন বিষয়ে বিশেষভাবে বলেছেন? জবাবে আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাধারণভাবে অন্য কাউকে বলেননি এমন কোন বিশেষ কথা আমাদেরকে বিশেষভাবে বলেননি। তবে আমার তরবারীর কোষের মধ্যে রক্ষিত এ বিষয়টি ছাড়া। অতঃপর রাবী বলেন, তিনি (তরবারীর কোষ থেকে) একটি লিখিত কাগজ বাহির করলেন। যাতে লেখা ছিল, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু যবেহ কবরে তার প্রতি আল্লাহ্র লা'নত। যে ব্যক্তি জমির সীমারেখা চুরি করে তার উপর আল্লাহ্র লা'নত। যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে অভিশাপ দিবে তার উপর আল্লহ্র লা'নত। যে ব্যক্তি বিদ'আতকারীর প্রশ্রয় দিবে তার প্রতি আল্লাহ্র লা'নত।[৫৫]

তাদের সাথে নোংরা বাক্য বিনিময় বা গালিগালাজ করাটাও কাবীরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَشْتُمُ أَبَاهُ وَيَشْتُمُ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কাবীরা গুনাহসূহের মধ্যে অন্যতম কাবীরা গুনাহ হল পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া। ছাহাবীরা বললেন, নিজের কোন পিতা-মাতাকে কেউ কী গালি দিতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যে অন্যের পিতা-মাতাকে গালি দিবে, প্রত্যুত্তরে সে তার পিতা-মাতাকে গালি দিবে (প্রকারন্তরে এটাই তো নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া)।[৫৬] সুতরাং পিতা-মাতার সাথে কোনরূপ বেয়াদবী করা বা তাদের প্রতি অভিশাপ দেওয়া কিংবা গালি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

অষ্টমত : সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দো'আ বিফলে যায় না

সন্তানের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য পিতা-মাতা সকল কষ্টকে তুচ্ছ মনে করে থাকে। যাবতীয় ঝড়-ঝাঞ্ঝা ও অনেক চড়াই-উৎরাই জয় করে সন্তানকে সুশিক্ষা ও আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলে। এজন্য সন্তান সুখ ও শান্তিতে জীবন-যাপন করলে সবচেয়ে খুশি হয় পিতা-মাতা। এক্ষেত্রে তাদের অকৃত্রিম প্রচেষ্টা ও আন্তরিক দো'আ খুবই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কেননা

---

৫১. আবুদাঊদ হা/২৫২৮; মুসনাদে আহমাদ হা/৬৪৯০; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪১৯; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৯, সনদ ছহীহ।

৫২. من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره-সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫৬৭; যঈফুল জামে' হা/৫৫০২; যঈফ আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২২; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হ/১৪৭৭।

৫৩. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২১; মুসলিম হা/৬৬৭৫, ৬৬৭৬; মিশকাত হা/৪৯১২।

৫৪. ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬৩; তিরমিযী হা/১৯০০; মুসনাদে আহমাদ হা/২৭৫৯২; মিশকাত হা/৪৯২৮; ছহীহুল জামে' হা/৭১৪৫, সনদ ছহীহ।

৫৫. মুসলিম হা/৫২৩৯-৪১; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৭; নাসাঈ হা/৪৪২২; মুসনাদে আহমাদ হা/৮৫৫, ৮৫৮, ৯৫৪, ১৩০৬; মিশকাত হা/৪০৭০।

৫৬. তিরমিযী হা/১৯০২; মুসনাদে আহমাদ হ/৬৫২৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৯৫০; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৭; বুখারী হা/৫৯৭৩।

সন্তানের জন্য পিতা-মাতা কর্তৃক দো'আ কখনো বিফলে যায় না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সন্দেহাতীতভাবে তিনটি দো'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করে থাকেন। (১) মাযলুম বা অত্যাচারিত ব্যক্তির দো'আ (২) মুসাফিরের দো'আ (৩) সন্তান-সন্ততিদের প্রতি পিতা-মাতার দো'আ।[৫৭] সুতরাং মানব জীবনের সার্বিক সফলতা ও অগ্রগতির সুউচ্চ সোপানে আরোহণ করতে হলে জীবিত থাকাবস্থায় পিতা-মাতার যথাযথ খেদমত করে আন্তরিক দো'আ পাবার বিকল্প নেই। কেননা তাদের দো'আয় যেমন জীবনের কল্যাণ ও সফলতা আসে, ঠিক তেমনি তাদের বদ দো'আর কারণে জীবনের উন্নতি বাধাগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হয়। অতএব বর্তমান এই যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে তাদের দো'আ প্রাপ্তির প্রতিযোগিতায় নেমে পড়া উচিত পাশ্চাত্যসহ সারা বিশ্বের সমাজ ও পরিবার বিমুখ বিশ্ব মানবতার।

নবমত : নফল ইবাদতের উপর পিতা-মাতার খেদমত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত

আধুনিক সভ্য যুগে সদ্ব্যবহার ও সেবা-শশ্রূষার অগ্রাধিকার নিয়ে নানা বিতর্ক হয়ে থাকে। অথচ পিতা-মাতার খেদমত করা সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। এমনকি নফল ছালাত কিংবা অন্য কোন নফল ইবাদতের তুলনায় পিতা-মাতার খেদমত করা যরূরী। হাদীছে এসেছে,

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জুরায়েজ (বানী ইসরাঈলের একজন আবেদ ব্যক্তি) তাঁর ইবাদতখানায় ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। একদা কোন একদিন তাঁর মাতা সেখানে আসলেন। হুমায়দ (রহঃ) বলেন, আমাদের কাছে আবু রাফি' এমন ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেন, যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মায়ের ডাকের ভঙ্গিতে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর কাছে ব্যক্ত করেছেন। কিভাবে তাঁর হাত তাঁর ভ্রুর উপর রাখছিলেন। এরপর তাঁর দিকে মাথা উঁচু করে তাঁকে ডাকছিলেন। বললেন, হে জুরায়েজ! আমি তোমার মা, আমার সাথে কথা বল। এ কথা এমন অবস্থায় বলছিলেন, যখন জুরায়েজ ছালাতরত ছিলেন। তখন তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ! (একদিকে) আমার মা আর (অপরদিকে) আমার ছালাত (আমি এখন কী করব?)'। বর্ণনাকারী বলেন, অবশেষে তিনি তাঁর ছালাতকে অগ্রাধিকার দিলেন এবং তাঁর মা ফিলে গেলেন। পরে তিনি দ্বিতীয়বার আসলেন এবং বললেন, 'হে জুরায়েজ! আমি তোমার মা, আমার সাথে কথা বল। তখন তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! আমার মা আর আমার ছালাত (আমি এখন কী করব?)'। এবারো তিনি তাঁর ছালাতকে অগ্রাধিকার দিলেন। তখন তাঁর মা বললেন, 'হে আল্লাহ! এ জুরায়েজ আমারই ছেলে। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। সে আমার সাথে কথা বলতে অস্বীকার করল। হে আল্লাহ! কোন ব্যভিচারিণীর মুখ না দেখা পর্যন্ত তার যেন মৃত্যু না হয়'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যদি তাঁর মাতা তাঁর বিরুদ্ধে অন্য কোন বিপদের জন্য বাদদো'আ করতেন তাহলে অবশ্যই তার উপর সে বিপদ পতিত হত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এক মেষ রাখাল জুরায়েজ-এর ইবাদতখানার নিকটেই (মাঝে মাঝে) আশ্রয় নিত। তিনি বলেন, এরপর গ্রাম থেকে এক মহিলা বের হয়ে এল। উক্ত রাখাল তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। ফলে মহিলাটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, এ সন্তান কোথা থেকে? সে উত্তর দিল, এ ইবাদতখানায় যে বাস করে, তার থেকে। তিনি বলেন, এরপর তারা শাবল, কোদাল ইত্যাদি নিয়ে এল এবং চীৎকার করে ডাক দিল। তখন জুরায়েজ ছালাতে মশগূল ছিলেন। কাজেই তিনি তাদের সাথে কথা বললেন না। রাবী বলেন, এরপর তারা তাঁর ইবাদতখানা ধ্বংস করতে লাগল। তিনি এ অবস্থা দেখে নীচে নেমে এলেন। এরপর তারা বলল, এ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করো। তখন জুরায়েজ মুচকি হেসে শিশুটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তোমার পিতা কে? তখন শিশুটি বলল, আমার পিতা মেষ রাখাল। যখন তারা সে শিশুটির মুখে এ কথা শুনতে পেল তখন তারা বলল, (হে জুরায়েজ!) আমরা তোমার ইবাদতখানার যতটুকু ভেঙ্গে ফেলেছি তা সোনা-রূপা দিয়ে পুনঃনির্মাণ করে দেব। তিনি বললেন, না; বরং তোমরা মাটি দ্বারাই পূর্বের ন্যায় তা নির্মাণ করে দাও। এরপর তিনি তার ইবাদতখানায় উঠে বসলেন।[৫৮]

(খ) মৃত্যু পরবর্তী তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য :

পিতা-মাতা মৃত্যুবরণের পর আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে। যেমন মীলাদ, চেহলাম, কুলখানি, চল্লিশা, শবিনা খতম, খানা, মৃত্যু বার্ষিকী প্রভৃতি। মূলতঃ মানুষ এ অনুষ্ঠানগুলো পিতা-মাতার পরকালীন জীবনের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য করে থাকে। আবেগের বশবর্তী হয়ে এ অনুষ্ঠানটি বাস্তবায়নে অঢেল অর্থ ব্যয় করে থাকে। সারা বছর খোঁজ থাকে না। মীলাদের দিন খুব ঘটা করে কথিত 'দো'আ অনুষ্ঠানে'র নামে পিতা-মাতার প্রতি ভালবাসার প্রদর্শনী পরিবেশিত হয়। অথচ জীবিত থাকাবস্থায় তারা তাদের পিতা-মাতার কোন খোঁজ-খবর রাখত না। হারাম উপায়ে উপার্জিত অর্থ দিয়ে বছরে একবার মীলাদ পড়লেই মনে করে আমরা আমাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছি। উপরন্তু সমাজে প্রচলিত উপরোক্ত প্রথাগুলোর ইসলামী শরী'আতে কোন ভিত্তি নেই। আর শরী'আতে যার কোন ভিত্তি নেই তা পালন করলে নেকীর পরিবর্তে গুনাহ হবে এবং তার পূর্বের কৃত সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে। ফলে পিতা-মাতার মৃত্যু পরবর্তী সময়ে যা করণীয় তা থেকে সমাজ অনেক দূরে অবস্থান করছে। এ বিষয়ে শরী'আতের বিধান স্পষ্ট।

(১) পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের জন্য দো'আ করা :

পিতা-মাতা মৃত্যুর পর তাদের জন্য সন্তান-সন্ততিদের প্রধান কাজ হল খালেছ অন্তরে তাদের জন্য দো'আ করা। কেননা এটা পরকালীন জীবনে অনেক কল্যাণকর। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

---

৫৭. তিরমিযী হা/১৯০৫,৩৪৪৮; আবুদাঊদ হা/১৫৩৬; মুসনাদে আহমাদ হা/৭৫০১; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৬৯৯; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৯৮৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৯৬; মিশকাত হা/২২৫০।

৫৮. মুসলিম হা/৬৬৭২, 'নফল ছালাত ও অন্য কোন নফল ইবাদতের উপর মাতা-পিতার খেদমত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত' অনুচ্ছেদ-২, 'সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার' অধ্যায়-৪৬।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন কোন মানুষ ইন্তেকাল করে, তখন তার সমস্ত আমলের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল ব্যতীত। যথা (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়া (২) এমন ইলম, যদ্বারা অন্যরা উপকৃত হয় (৩) সুসন্তান, যে তার পিতা-মাতা ইন্তেকালের পর তাদের জন্য দো'আ করবে।[৫৯] অন্যত্র তিনি বলেন, 'মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। তখন সে ব্যক্তি বলে, 'প্রভু! এ কি ব্যাপার?' তখন তাকে বলা হয়, 'তোমার পুত্র তোমার জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করেছে।[৬০] সুতরাং পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করার পর তাদের আত্মার মাগফিরাতের জন্য খালেছ অন্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

(২) পিতা-মাতার জন্য দান করা :

পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করলে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। আর এ মর্মে সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব ও কর্তব্য হল তাদের মৃত্যুর পর তাদের জন্য খালেছ অন্তরে দান করা।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّىْ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تُوْصِ أَفَنَفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার মাতা ইন্তিকাল করেছেন। কিন্তু তিনি কোন অছিয়ত করে যাননি। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করি, তাহলে তার ফায়দা হবে কী? তিনি বললেন, হ্যাঁ, (তিনি তার নেকী পেয়ে যাবেন)।[৬১] অতএব পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদের মাগফিরাতের জন্য বেশী বেশী ছাদাক্বা করতে হবে।

(৩) পিতা-মাতার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা :

পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তারা যাদের সাথে উঠাবসা বা চলাফেরা করতেন যেমন তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী ইত্যাদি পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। আর তাদের সাথে পিতা-মাতার কৃত সম্পর্ক বজায় রাখা সন্তানের উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য। ফলশ্রুতিতে তারা তাদের পিতা-মাতার প্রশংসা করবে, তাদের জন্য দো'আ করবে বা তাদের জন্য অনেক সময় দানও করতে পারে। যা বারযাখী জীবনে অস্থানকালসহ ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত তার নেকীর ধারা অব্যাহত থাকবে। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يُصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয় সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হল পিতা-মাতার বন্ধুদের প্রতি সদ্ব্যবহার।[৬২]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَلَسْتَ ابْنَ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ قَالَ بَلَى. فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ ارْكَبْ هَذَا وَالْعِمَامَةَ قَالَ اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ. فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّىَ. وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হতেন, তখন তাঁর সাথে একটি গাধা থাকত। উটের সওয়ারীতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ক্ষণিক স্বস্তি লাভের জন্য তাতে আরোহণ করতেন। আর তাঁর সঙ্গে একটি পাগড়ি থাকত, যা দিয়ে তিনি মাথা বেঁধে নিতেন। কোন এক সময় তিনি উক্ত গাধায় আরোহণ করে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পাশ দিয়ে একজন বেদুইন অতিক্রম করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী অমুকের পুত্র অমুক নও? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে গাধাটি দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এতে আরোহণ কর। তিনি তাকে পাগড়িটিও দান করলেন এবং বললেন, এটি দ্বারা তোমার মাথা বেঁধে নাও। তখন তাঁর সঙ্গীদের কেউ কেউ তাঁকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি এ বেদুইনকে গাধাটি দিয়ে দিলেন, যার উপর আরোহণ করে আপনি স্বস্তি লাভ করতেন এবং পাগড়িটিও দান করলেন, যার দ্বারা আপনার মাথা বাঁধতেন। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হল কোন ব্যক্তির পিতার ইন্তিকালের পর তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখা। আর এ বেদুইনের পিতা ছিলেন (আমার পিতা) ওমর (রাঃ)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু।[৬৩] সুতরাং উপরোক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, পিতা-মাতা ইন্তিকালের পর তাদের বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে, যা শিশুর শৈশবকালীন শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। উল্লেখ্য যে, আদাবুল মুফরাদে 'পিতা যাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন তাদের প্রতি সদ্ব্যবহর করা' ও 'পিতার বন্ধুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর না, করলে আলো নিভে যাবে' অনুচ্ছেদে বর্ণিত দু'টি হাদীছই যঈফ।[৬৪]

পরিশেষে উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হয় যে, সন্তানের জীবনের সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতির মূল উৎসধারা হল পিতা-মাতা। অতএব প্রত্যেক সন্তান-সন্ততির উচিত তাদের ব্যাপারে অতি যত্নবান হওয়া এবং দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালন করা। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!!

[লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি]

---

৫৯. তিরমিযী হা/১৩৭৬; ছহীহ ইবুন হিব্বান হা/৩০১৬; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২৪৯৪; ছহীহ ওয়া যঈফুল জামে'ইছ ছগীর হা/৭৯৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৮, সনদ ছহীহ।

৬০. আদাবুল মুফরাদ হা/৩৬, সনদ হাসান। عن أبي هريرة قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي رب أي شيء هذه فيقال ولدك استغفر لك

৬১. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৯; বুখারী হা/২৭৬০; মুসলিম হা/৪৩০৮; আবুদাউদ হা/২৮৮১; নাসাঈ হা/৩৬৪৯; মুসনাদে আহমাদ হা/২৪২৯৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৩৫৪; ছহীহ ইবনু খুযাইমা হা/২৫০০; মুয়াত্বা মালেক হা/২৮১২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬১৫, সনদ ছহীহ।

৬২. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪১; ছহীহ মুসলিম হা/১৩৭-এর টিকা দ্রষ্টব্য, সনদ ছহীহ।

৬৩. ছহীহ মুসলিম হা/৬৬৭৯, 'পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব প্রমুখের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার মর্যাদা' অনুচ্ছেদ-৪, 'সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার' অধ্যায়-৪৬; সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ হা/২০৮৯-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৬৪. যঈফ আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪০ ও ৪২; সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৮৯।

হরতাল-অবরোধ, দগ্ধ মানবতা ও উত্তরণে উপায়

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম

ভূমিকা :

বার্ন ইউনিটের আর্তচিৎকার ও সাধারণ মানুষের কষ্টের নিঃশ্বাসে বিশাল গগনের মুক্তপবন আজ কলুষিত। মানবতা আজ পদদলিত। রাজনীতির নামে রাজনীতিবিদদের রক্তপিপাসার প্রতিচ্ছবি আজ সর্বত্র দৃশ্যমান। রাজনীতি হল রাজার নীতি, তাই তাঁর নীতি বাস্তবায়ন করাই রাজনীতিবিদদের একমাত্র কাজ। অথচ বর্তমানের রাজনীতি মানব মস্তিষ্ক প্রসূত, যা সম্পূর্ণ নৈতিকতা বিবর্জিত। কেননা রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ফক্স (FOX) বলেছেন, What is morally wrong can never be politically right. We may say that politics is conditioned be ethics. অর্থাৎ 'নৈতিকতার দিক দিয়ে যা ভুল রাজনীতির দৃষ্টিতে তা কখনোই সমীচীন হতে পারে না। তাই বলা যায় রাজনীতি ও নৈতিকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত'।

সুধী পাঠক! দেশে চলমান রাজনীতিতে সামান্যতম নৈতিকতার কোন স্থান নেই। ফলশ্রুতিতে ক্রসফায়ার, নিরাপত্তার অজুহাত এবং হরতাল-অবরোধের নাম দিয়ে নেতারা আজ হত্যাযজ্ঞে মত্ত হয়েছে। গত ৫ জানুয়ারী থেকে বড় দুই রাজনৈতিক জোটের লাগাতার সংঘাতের ফলে দেশ আজ বিপর্যস্ত। অথচ কথিত 'গণতন্ত্র হত্যা ও রক্ষা দিবস'-এর পর থেকে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে মানবতা, বিনষ্ট হয়েছে দেশের সম্পদ, অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রায় শতাধিক সাধারণ জনগণ মানবেতর জীবন-যাপন করছে। আর ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ তো নিত্য দিনের ঘটনা। এক জরিপে বলা হয়েছে, ৫ জানুয়ারীর পর থেকে ৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মৃত মানুষের সংখ্যা ৫৪ জন, অগ্নিদগ্ধ হয়ে মেডিকেলে ভর্তি ১১২ জন, ৯০০ যানবাহন আগুন ও ভাংচুরের শিকার, অর্থনৈতিক ক্ষতি মোট ৬৮ হাযার ৩৩৬ কোটি টাকা *(দৈনিক কালেরকণ্ঠ, ৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৫)*। কেউ কেউ বলেন, গত এক মাসে অর্থনীতির যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা দ্বারা দু'টি পদ্মা সেতু অনায়াসে তৈরী করা সম্ভব। অতএব দেশের চলমান সংকটময় এই পরিস্থিতির জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নৈতিকতা ও বিবেকবোধ অনুপস্থিতি এবং ক্ষমতা দখল ও স্থায়ীকরণের স্পৃহায় মূল দায়ী।

সংঘাত-সহিংসতার সূত্রপাত :

৫ জানুয়ারী ২০১৪। প্রথা অনুযায়ী বিগত সরকারে পাঁচ বছর মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে উক্ত নির্বাচন ছিল বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ। তৎকালীন সরকারের দৃষ্টিতে এটি ছিল সাংবিধানিক নিয়ম রক্ষার নির্বাচন। অন্যদিকে বিরোধী দলের নিকট ছিল ত্রুটিপূর্ণ ও ষড়যন্ত্রমূলক নির্বাচন। সরকারী দল 'একতরফা' নির্বাচন করে খালি মাঠে গোল করার কৌশলকে সামনে রেখে বিরোধী জোটকে কানাগলির পথে পা ফেলতে প্ররোচিত করে। ফলে তারা সরকার পতনের আন্দোলনের ডাক দেয় এবং নির্বাচন বয়কট করে। রাজনীতিতে তৈরি হয় দুপক্ষের মধ্যে একটি 'জুয়া খেলার কম্পিটিশন'। ১৫৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিহীন জনপ্রতিনিধির অবির্ভাব ঘটে। ফলে জনগণের ভোট ছাড়াই নির্বাচনের পূর্বেই সরকারী দল সরকার গঠনের সক্ষমতা অর্জন করে। অন্যদিকে জাতীয় পার্টিকে নিয়ে গঠিত হয় 'গৃহপালিত বিরোধী দল'। দু'পক্ষের কাছেই ৫ই জানুয়ারীর নির্বাচনটি ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা দ্বন্দ্বের এসপার-ওসপারের চূড়ান্ত দিন। তাই এদিনটিকে সরকারী দল 'গণতন্ত্র রক্ষা দিবস' হিসাবে ঘোষণা করে। আর বিরোধী দল ঘোষণা করে 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস'। এক বছর পর গত ৫ জানুয়ারী ২০১৫-কে কেন্দ্র করে দু'দল কর্মসূচী ঘোষণা করে। একদল 'গণতন্ত্র রক্ষা দিবস' পালন তো অন্যদল 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' পালন ও দাবী আদায়ের লাগাতার আন্দোলন। ফলে দেশ এক চরম সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। বিরোধীজোট সহিংসতা সৃষ্টি করে পরিস্থিতিকে নৈরাজ্যপূর্ণ ও অনিশ্চিত করে তোলে। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সরকারী বাহিনী বিরোধীদের জেল-যুলুম, হত্যা-গুম ও ক্রসফায়ারের নামে মানব হত্যা করছে। অন্যদিকে গণতন্ত্র হত্যা দিবসের নামে চলছে হরতাল-অবরোধ, পেট্রোলবোমা ও ককটেল নিক্ষেপ করে মানব সমাজকে করা হচ্ছে অগ্নিদগ্ধ। ঝলসানো হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। অর্থনীতির চলমান প্রক্রিয়া ভেঙ্গে পড়েছে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। কোথাও যেন কোন নিরাপত্তা নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল গণতন্ত্র হত্যা বা রক্ষার নামে কেন এই বর্বরতা! কেন এই অসভ্যতা! এরই নাম কী তথাকথিত জনগণের জয়গান, গণতন্ত্রের বিজয়গাঁথা এবং মানবাধিকারের সয়লাব!!

সুধী পাঠক! গণতন্ত্র রক্ষা বা হত্যা মূল বিষয় নয়; রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও স্থায়ীকরণই মৌলিক বিষয়। কেননা বর্তমানে রাষ্ট্রযন্ত্র সর্বাধিক লুটপাটের স্থান। ফলে উভয় জোটই নেমেছে মানুষ হত্যার বাণিজ্যে। তাই বর্তমানে চলমান সহিংসতাপূর্ণ রাজনীতি আদর্শহীন ও নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত। বরং অতি কুৎসিত দলবাজি ও ক্যাডারবাজিই এর মুখ্য বিষয়।

হরতাল-অবরোধ ও আমাদের স্বাধীনতা :

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার নেপথ্যে অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আলাদা হয়েছিল স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণভাবে জীবন-যাপন ও নিরাপত্তার সাথে ধর্ম পালন করার জন্য। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে আমরা কি পেয়েছি। পেয়েছি যালেমদের ত্রাস সৃষ্টি করা রাজনীতি। স্বার্থের জন্য মানবতা হত্যা-গুম-খুন-রাহাজানী ইত্যাদি। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলার যমীনে যা ঘটেছে তা তো ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। ১৯৭১ সালের পর থেকে বাকশালের বিদায়, স্বৈরতন্ত্রের পতন, অদৃশ্য শক্তির বিলুপ্তি, গণতন্তের জয়গান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিদায়। অবশেষে গণতন্ত্র হত্যা ও রক্ষা দিবস। ভবিষ্যতে আমরা রাজনীতির নামে আরো কত কিছু দেখতে পাব তা এখন অদৃশ্য। আমাদের স্বাধীনতা এখন হরতাল-অবরোধের, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য মানুষ হত্যার, যানবাহন চলাচল ও উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার, জনজীবনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে স্থীর করে দেওয়ার, চোরাগোপ্তা হামলা করে পেট্রোলবোমা ছুড়ে সাধারণ মানুষকে পুঁড়িয়ে অঙ্গার বানানো, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষা বঞ্চিত করে জাতিকে মেধাশূন্য করার, বিদেশে মাতৃভূমির ভাবমূর্তি কলুষিত করার, ক্রসফায়ারের নামে মানব হত্যা করার, নিরাপরাধ মানুষকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করার, শোকাহত মাকে সমবেদানার সময় মেইন গেটে তালাবদ্ধ রাখার, বৃদ্ধ মহিলা ও এতিম শিশুদের বিদ্যুৎ লাইন কেটে দিয়ে ১৯ ঘণ্টা অন্ধকারে রাখা এবং মানুষকে পুড়িয়ে অঙ্গার করে দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার। স্বাধীনতা ও রাজনীতির অর্থ যদি এই হয় তাহলে আমরা এই হাঙ্গামাপূর্ণ রাজনীতি চায় না, চায় না এই নিরাপত্তাহীন স্বাধীনতা।

রক্তক্ষয়ী উৎসবে মানবেতর জীবন :

মানুষের আজ মরণ দশা। কথায় বলে, 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে উলু খাগড়া পুড়ে মরে'। কিংবা বলে, 'পাটায় পুতায় ঘষাঘষি-এদিক মরিচের দফা শেষ'। দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা হয়েছে তেমনই। স্বাধীনতার পর আমরা কাউকে নাম দিয়েছি স্বৈরাচার, কেউবা রাজাকার কেউবা গণতন্ত্রকামী আবার কেউবা বাকশালকামী। বলা হয়ে থাকে এক জোটে রাজাকার আরেক জোটে স্বৈরাচার। রাজাকার বা স্বৈরাচার বলে কথা নয়, মূলতঃ সঙ্গে থাকলে সঙ্গী আর না থাকলে জঙ্গী। ফলে জঙ্গীকে দমন করার জন্য দেশের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে সরকার ও বিরোধী জোট জঙ্গী নিবারিত অনলে দিনাতিপাতি করছে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে অনিশ্চিয়তার পথে ঠেলে দিয়ে উৎসবে মেতেছে বুর্জোয়া দুই রাজনৈতিক জোট। তাদের রক্তক্ষয়ী উৎসবে সাধারণ জনতা আজ মানবেতর জীবন যাপন করছে। আর তারা এসি ঘরে রাজার মত জীবন অতিবাহিত করছে।

গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রতারণার আবাহন :

গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা মূলতঃ প্রতারণার আমন্ত্রণ। এখানে প্রতারণায় যারা চতুর তারাই ক্ষমার মালিক। অথচ গণতন্ত্রের কাঠামোগত উপাদানের মূল বিষয় হল 'জনগণের ক্ষমতায়ন'। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'। এটি একটি শিরকী আক্বীদা। কেননা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। অথচ জনগণের ক্ষমতায়নের নামে গণতন্ত্রের এই শঠতা, জোচ্চুরি আর কতদিন? ক্ষমতায়নের নামে জনগণের সাথে প্রবঞ্চনা আর কতদিন? ক্ষমতায়নের নামে গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতি হল টাকার খেলা, পেশীশক্তির দাপট, প্রশাসনিক কারসাজি, সাম্প্রদায়িক প্রচারণার ধূম্রজাল, হরতাল, অবরোধের নামে অগ্নিদগ্ধ ঝলসানো পচা মানবদেহের গন্ধ, হত্যা-গুম অবশেষে ক্রসফায়ারের নামে মানব হত্যা। যার বাস্তব প্রতিচিত্র আজকের সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারপরও কি জনগণের সুবুদ্ধির উদয় হবে না! মানবরচিত পচা দুর্গন্ধযুক্ত গণতন্ত্রের দ্বারা মানবতা আর কত পিষ্ট হবে?

মৃত্যু ও অঙ্গহানির তামাশা এবং আমাদের নিরাপত্তা :

'মানুষের মৃত্যু' যেখানে প্রসঙ্গ, পরিসংখ্যান সেখানে নিছক পরিহাস। স্বাধীন বাংলার জনগণ আজ নিরাপত্তাহীন। অথচ আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেছেন। তাকে দিয়েছেন স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা। কিন্তু মানবসমাজের এই স্বাধীনতা আজ কোথায়? একজন মানুষের শেষ ঠিকানা মৃত্যু। চাই তিনি টমেটোর ট্রাকের ড্রাইভার হোন, হেলপার হোন অথবা নামধারী রাজনীতিবিদের ছেলে-মেয়ে হোন। চারদিকে পেট্রোলবোমা, ককটেল, বুলেট ও গুলির আওয়াজের জোয়ার দেখছি। প্রতি মুহূর্তে মানুষের অবমাননা দেখছি, দেখছি বার্ন ইউনিটের ঝলসানো শরীরের আর্তচিৎকার। হতভম্ব হচ্ছি বাংলার এই প্রতিচিত্রের দিকে তাঁকিয়ে। রাজপথের দেয়ালে দেয়ালে আজ দেখা যাচ্ছে জনগণের চামড়া পেট্রোলবোমায় দগ্ধের তামাশা।

সুধী পাঠক! এরপরেও অনিশ্চয়তার মধ্যে মানুষ জীবন বাঁচানোর জন্য ও পরিবারের খাদ্য যোগানোর তাকীদে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বের হচ্ছে। তারপর পেট্রোলবোমা, ককটেল অথবা সরকারী বাহিনীর ক্রসফায়ারে মৃত্যু, অঙ্গহানি অতঃপর বার্ন ইউনিটের সদস্য। রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের রয়েছে পুলিশি নিরাপত্তা, ধনী ব্যবসায়ীদের আছে নিজস্ব স্কট ও অন্যান্য নিরাপত্তা; কিন্তু সাধারণ জনগণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কী? অথচ তাদেরকে ঋণ নিয়ে বেগুন, আলু, টমেটো চাষ করে তা নিয়ে বাজারে যেতে হচ্ছে জীবনের তাকীদে। অবশেষে মৃত্যুযাত্রী হয়ে টমেটোর যানে বা ট্রাকে রাজপথেই পরলোক গমন। তাহলে আমাদের মত সাধারণ জনগণের কী কোন নিরাপত্তা নেই। আমরা কী সারাজীবন রাজনীতিবিদদের বলির পাঠা হয়ে থাকব! তাছাড়া নিরাপত্তা তো কোন দাবি হতে পারে না; বরং অধিকার। যে অধিকার আল্লাহ আমাদের প্রদান করেছেন। এ অধিকার হরনের অধিকার কারো নেই।

অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা :

বর্তমান সহিংস রাজনীতির কবলে বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড প্রায় ভেঙ্গে যাচ্ছে। সাম্প্রতিকালের টানা অবরোধ, হরতাল ও নাশকতার কবলে দেশের দৈনিক ক্ষতির পরিমাণ অনেক। ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর দাবি হরতাল-অবরোধ ও সহিংসতার কারণে প্রতিদিন প্রায় ২ হাযার ৫০০ কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। পরিবহন খাতে ৩০০ কেটি, পোশাক খাতে ৬৯৫ কোটি, কৃষি, পোল্ট্রি ও হিমায়িত খাদ্যে ক্ষতির পরিমাণ ৩১৪ কোটি টাকা। অন্যদিকে জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশনের মতে চলমান অবরোধে ২০ হাযার টন পাট-সূতা রফতানী কমেছে। পণ্য জাহাজীকরণ সময়মত না হওয়ায় ক্রেতারা বিক্রয় চুক্তি বাতিল করার হুমকি দিয়েছেন। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে বাংলাদেশের সোনালী আঁশের ২৫০টি পাটকল অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে *(দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ জানুয়ারী ২০১৫)*।

সুধী পাঠক! বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ৪৪তম। বাংলাদেশ বছরে প্রায় ১৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে থাকে। অথচ এই উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থবিরতা ও হুমকির মধ্যে নিমজ্জিত করছে দেশের চলমান সহিংস রাজনীতি। অতএব শান্তিপূর্ণ সমাধান আশু যরূরী।

শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থবিরতা :

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। একটি জাতির মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করে দেশের শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদগণ। কিন্তু আমাদের শিক্ষাবিদ এবং রাজনীতিবিদগণ রক্তের হলি খেলায় মত্ত হয়েছেন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে 'দলাদলি, হানাহানী, খুন, রাহাজানী, টেণ্ডারবাজি, ভর্তি বাণিজ্য সহ শিক্ষাঙ্গনকে করেছে কলুষিত। দেশের বর্তমান পরিবেশের জন্য প্রায় পাঁচ কোটি শিক্ষার্থী তাদের আপন ভুবন নিজ বিদ্যাপিঠে যেতে ভীত সন্ত্রস্ত। এস.এস.সি সহ সমমানের পরীক্ষার্থীরা উদ্বিগ্ন। এই কোমলমতি ছাত্রদের মানসিকতায় কি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে তাকি একবারও আমরা ভেবে দেখেছি? বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি শিশু ও তরুণ শিক্ষার্থীদের হৃদয়পটে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে তা-কি কখনো মুছে ফেলা সম্ভব হবে? রাজনীতিবিদদের কোন সমস্যা নেই। কেননা তাদের ছেলে-মেয়েরা কেউ দেশে পড়াশুনা করে না। শিক্ষার মেরুদণ্ড যদি ভেঙ্গে দেয়া না হয় তাহলে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে দলীয় ক্যাডারবাজি, বোমাবাজি, টেণ্ডারবাজি কে করবে? দলীয় নেতা-নেত্রীদের অস্ত্রের মাধ্যমে রক্ষা করবে কে? কে করবে ত্রাস সৃষ্টি? হরতাল-অবরোধ, ক্রসফায়ারের নাম শুনলে শরীরে শিহরণ জাগে। একজন ছাত্র তার স্নাতকোত্তর শেষ করে চিন্তা করে যে, সে দেশের জন্য কী আবিষ্কার করবে, কী গবেষণা করে জাতিকে উন্নয়নের পথ দেখাবে; অথচ না, সে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি হয়েই ভাবে সে কোন্ দলের আশ্রয়ে থাকবে। ভর্তি বাণিজ্য ও টেণ্ডারবাজি কিভাবে করবে। ছাত্ররাজনীতির ছত্রছায়ায় থেকে দলীয় সমর্থন পেয়ে কিসের চাকুরী করবে? আর ভাববেই না কেন, দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি যদি বলে, 'তোমরা লিখিত পরীক্ষায় পাশ কর, চাকুরী দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের'।

যে যত ত্রাস, গুম-খুন করতে পারবে তার জন্য তত উঁচুদরের চাকুরী, সম্মান, বড় পর্যায়ের নেতৃত্ব, মন্ত্রীত্ব, এমপি আমরা দেব ইত্যাদি হল রাজনীতিবিদদের কথা। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় আজ ত্রাসের রাজ্য। মাসের পর মাস বন্ধ হয়ে থাকছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। পরীক্ষা স্থগিত হয়ে আছে সপ্তাহের পর সপ্তাহ। এখন বাকী কেবল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়। সেটাও পুরাপুরি সফল হচ্ছিল। কিন্তু আজ তাও হরতাল-অবরোধের শৃঙ্খলে বন্দি। যেখানকার প্রায় ১৫ লক্ষ পরীক্ষার্থী আজ উদ্বিগ্ন, কী হবে তাদের ভবিষ্যত! পারবে তো তারা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করতে? না-কি চলমান সহিংসতার হিংস্র শিকারে পরিণত হবে তারা!!

চলমান সহিংসতার শেষ কোথায় :

দেশে চলমান সহিংসতা নিয়ে যখন কাগজ-কলম নিয়ে কাজ করছিলাম, তখনও সহিংসতা বন্ধ হয়নি। ঘুম থেকে উঠে মোবাইলের ডিসপ্লে স্ক্রিনে সদ্য সংবাদ পেলাম পেট্রোলবোমায় পুড়ে কয়লা সাত জন। ভোর হল না, গন্তব্যেও পৌঁছা গেল না। ঘুমের মধ্যে কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব শেষ। আহত ও দগ্ধ হয়েছেন কমপক্ষে ২৮ জন। ভোর রাত সাড়ে তিনটার দিকে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে এই হামলা হয়।

সুধী পাঠক! এই সহিংসতার শেষ কোথায়? একদিকে পেট্রোলবোমায় হতাহতদের জন্য মায়াকান্না, অন্যদিকে দহনযজ্ঞ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্র প্রলম্বিত করার জন্য অবরোধের সাথে হরতাল বৃদ্ধি করা। আবার ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ণ ইউনিটের জন্য প্রধাণমন্ত্রীর চারকোটি টাকার অনুদান। সরকার বুঝতে পারছে এই বার্ন ইউনিটগুলোর আসন সংখ্যা সীমিত, তাই বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে বার্ন ইউনিট খোলা হচ্ছে, আসন সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু সমাধানের পথ কি হবে তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। বিরোধী জোট তোমরা জ্বালাও-পোঁড়াও আর রোগীদের সারিবদ্ধভাবে বার্ন ইউনিটে ভর্তি করে দাও। খরচ যা লাগে আমরা সরকার বহন করব। সরকারী জোট তোমরা আসন তৈরী কর, শূন্য আসন পুরণ করার দায়িত্ব আমাদের। দুই রাজনৈতিক জোটের মানসিকতা দেখে তাই মনে হচ্ছে।

এই সহিংসতার জন্য বিরোধী জোট যেমন দায়ী ঠিক তেমনি সরকারী দলও সমানভাবে দায়ী। রাজনীতির নামে এই নাশকতার আগুনে রাঘব বোয়ালদের কিছু হচ্ছে না। কেবল চুনোপুঁটিরাই পুড়ে মরছে। আর তাদের জীবন নিয়ে খেলায় মত্ত হয়েছে রাঘব বোয়ালরা। রাজায় রাজায় যুদ্ধে ওলু খাগড়ার বন উজাড় হতে থাকলে সেই বিরানভূমিতে রাঘব বোয়ালদের সমাধি হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হুঁশিয়ারী করে বলেন, وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا- وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا 'তোমরা পরস্পরকে হত্যা কর না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি কৃপাময়। যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে এবং অন্যায়ভাবে এটা করবে, তাকে আমি অতিসত্তর অগ্নিতে দগ্ধ করব। আর এটা আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ' *(নিসা ৪/২৯-৩০)*।

অতএব হে সরকারী ও বিরোধী দলীয় নেতা-নেত্রীবৃন্দ! পেট্রোলবোমার বিভীষিকা থেকে মানবতাকে রেহায় দিন। ক্ষমতাকেন্দ্রিক এই হানাহানি বন্ধ করুন। তা নাহলে মাযলুমদের আর্তনাদে আসমানের আরশ কেঁপে উঠবে। ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবেন আপনারা। আজ সামান্য ক্ষমতার জন্য ক্বিয়ামতের চিরস্থায়ী অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হতে হবে। হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَىْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি এবং অন্য কোন বিষয়ে যুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেয়; সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন তার কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না। সেদিন তার কোন সৎকর্ম না থাকলে তার যুলুমের পরিমাণ তা তার নিকট হতে নেয়া হবে। আর তার কোন সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ হতে নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে' *(বুখারী হা/২৪৪৯)*।

শেষ পরিণতি কী হবে? :

আমরা যাচ্ছি কোথায়? আমাদের পরিণতিই বা কি হবে? অস্থিতিশীল ভূখণ্ডে আমাদের বাস। বাংলাদেশের বিশিষ্ট্য অর্থনীতিবিদ ড. আকবর আলী খান তার 'অন্ধকারের উৎস হতে' বইয়ে বাংলার রাজনীতিতে হিংসা ও হানাহানির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট দেখিয়েছেন। বাংলাদেশ যেন সুপ্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি অস্থিতিশীল ভূ-খণ্ডের অন্তর্গত। মোঘল ঐতিহাসিক আবুল ফযল বাংলাদেশকে 'অশান্ত আবাসে'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তিনি মোঘল সময়ে এ দেশ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন আজ আমরা তার বাস্তব চিত্র দেখছি। গুম-খুন-হত্যা, রাহাজানী, দলীয় ক্যাডারবাজী, হরতাল-অবরোধে দেশ আজ 'বুলঘকখানায়' পরিণত হয়েছে। রক্তারক্তি ও হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির জন্য নব্বইয়ের পরের রাজনৈতিক সরকারের ২১ বছরের রাজনৈতিক হিংসায় ২ হাযার ৮৫৫টি খুন হয়। ২০০৭-০৮ সালের অরাজনৈতিক সরকারের দুই বছরে সেই খুনের মাত্রা ১১টিতে নেমে এসেছিল। গত ছয় বছরে আওয়ামীলীগের হাতে আওয়ামীলীগ খুন হয় ১৭২ জন, এ সময় আরো ২৪৬ জন আওয়ামীলীগের জীবন আওয়ামীলীগ বাঁচাতে পারেনি। আওয়ামীলীগ ও বিএনপির সহিংসতায় নিহত হয় ১৫১ জন। বিএনপি নিজেরা খুনোখুনি করে ৩৪ জন মরেছে। সর্বোচ্চ ১ হাযার ২১৯টি রাজনৈতিক খুন হয় তার গত আমলে *(দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ জানুয়ারী ২০১৫)*। আজকের রাজনীতিবিদরা হলেন অন্ধ ও বোবা, যাদের দেশের প্রতি কোন মায়া নেই, নেই ভালবাসার কোন চিহ্ন। দেশ চলছে মূর্খদের পরামর্শে। ফলে দেশের এই করুণ পরিণতি। জীবনানন্দ দাস বলেছেন,

'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই-প্রীতি নেই
করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া'।

দগ্ধ মানবাতা : নব্য জাহেলিয়াতের নগ্ন বর্বরতা

পেট্রোলবোমায় ভস্মীকৃত মানবতা নব্য জাহেলিয়াতের এক নিষ্ঠুর বর্বরতা। এটা কোন রাজনীতি বা গণতন্ত্রের নতুন রূপ নয়। এটা জাহেলিয়াতের পুরাতন রূপ। জাহেলিয়াতের গোত্র দ্বন্দ্বের পরিবর্তে নব্য জাহেলিয়াতের দলীয় সংঘাত। পৃথিবীর ইতিহাসে লেলিহান অগ্নিশিখায় মানব জাতিকে ঝলসানোর অনেক ইতিহাস বিদ্যমান। আজকের পেট্রোলবোমায় যখন গর্ভবতী মা ও সাফীর মত নিষ্পাপ দুগ্ধপৌষ্য শিশুর শরীর ঝলসে যায়, তখন ইউসুফ যু-নুওয়াস বিন তুব্বার শাসনকালে ঐ শিশুটির কথা স্মরণ হয়, যখন ইউসুফ যু-নুওয়াস হাযার হাযার মানুষকে বড় বড় ও দীর্ঘ

গর্ত খুড়ে বিশাল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে সবাইকে হত্যা করেন। নিক্ষেপের আগে প্রত্যেকে তাওহীদ বর্জনের বিনিময়ে মুক্তির কথা বলা হয়। কিন্তু কেউ তা মানেনি। তারা অগ্নিকুণ্ডে তাদের জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছে এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। তবুও তারা আল্লাহ্র একত্বকে বিসর্জন দেয়নি। শেষ দিকে এক মহিলা তার শিশু সন্তান কোলে নিয়ে ইতস্ততঃ করছিলেন। হঠাৎ কোলের অবোধ শিশুটি বলে ওঠে, اِصْبِرِيْ يَا أُمَّهُ فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ 'ধৈর্য ধর মা! কেননা তুমি সত্যের উপর আছ'। তিরমিযীর বর্ণনানুযায়ী ঐদিন ৭০ হাযার মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়। বিগত যুগে গর্তওয়ালা ও দগ্ধকারী সম্রাট ছিলেন তিনজন। (১) ইয়ামানের বাদশাহ ইউসুফ যু-নুওয়াস (২) রোম সম্রাট কনস্টান্টাইন বিন হিলাসী (৩) পারস্য সম্রাট বুখত নছর *(মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন (৩০ তম পারা), পৃঃ ২০৭-২০৮)*। শুধু তাই নয় আবুল আম্বিয়া বা নবীগণের পিতা ইবরাহীম (আঃ)-কে তৎকালীন বাদশাহ নমরূদ কর্তৃক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল পুড়িয়ে মারার জন্য। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের সময় ইবরাহীম (আঃ) বলে উঠেন, حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 'আমার জন্য আল্লাই যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক' *(বুখারী হা/৪৫৬৩)*। সাথে সাথে আল্লাহ্র নির্দেশ এল, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ 'হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং ইবরাহীমের উপরে শান্তিদায়ক হয়ে যাও' *(আম্বিয়া ২১/৬৯)*। অতঃপর ইবরাহীম মুক্তি পেলেন। আজকের শাসকগণ ও বিরোধী সাবেক শাসকগণ হলেন নব্য জাহেলিয়াতের নমরূদ, ইউসুফ যু-নুওয়াসের প্রতিবিম্ব। তারা তাদের সময় সাধারণ জনগণকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়ে মেরেছে। আর আজ নব্য জাহেলিয়াতের রাজনীতিবিদগণ 'আম জনতাকে পেট্রোলবোমা ও ক্রসফায়ারে মারছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল তৎকালীন সময়ে জনগণকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল আল্লাহ্র একত্বকে আঁকড়ে ধরার জন্য। কিন্তু আজ অগ্নিদগ্ধ করা হচ্ছে তথাকথিত গণতন্ত্রের জন্য। তারপরও কি মানবতা জাগবে না! আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে না! নোংরা গণতন্ত্রকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করবে না!!

মানব হত্যা, হরতাল-অবরোধ ও ইসলাম :

সংঘাতময় রাজনীতিতে যা ঘটছে তাতো এক বর্বরতা ও অসভ্যতা। ইসলামে একজন অন্যজনকে কষ্ট দেওয়া ও হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাই আমরা অন্যায়ভাবে মানুষকে নিরাপত্তার অজুহাতে গুলি করে হত্যা করতে পারি না। তেমনিভাবে হরতাল-অবরোধের নামে মানুষের চলাচলের পথরোধ ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদি আমরা ইসলামের মর্মবাণী পুরোপুরি অনুধাবন করি তাহলে আমাদের মধ্যে আর কোন সংঘাত ঘটবে না ইনশাআল্লাহ।

ইসলামে মানব জাতির মর্যাদা :

ইসলাম মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করেছে। তাই ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানব জাতিকে অপমানিত ও হত্যা করা যাবে না। মানব মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا 'নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৭০)*।

ইসলামে মানব হত্যা :

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা লাভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনরূপ কারণ ব্যতীত এবং আইনের চূড়ান্ত বিচার ও তার দণ্ডস্বরূপ প্রাণ সংহার ব্যতীত অন্য কোন মানুষকে কোনভাবে হত্যা করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ 'যথাযথ কারণ ছাড়া আল্লাহ যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে তোমরা হত্যা কর না' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৩)*। مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا 'যে ব্যক্তি মানুষ হত্যা কিংবা যমীনে সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে হত্যা করে সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করল। আর যে মানুষের প্রাণ বাঁচালো, সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ বাঁচালো' *(মায়েদা ৫/৩২)*। وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا 'আর যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম। যাতে সে স্থায়ীভাবে থাকবে তার উপর আল্লাহ্র ক্রোধ ও অভিসম্পাত। আল্লাহ তার জন্যে মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন' *(নিসা ৪/৯৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا 'যে লোক আমাদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(বুখারী হা/৬৮৭৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِى الدِّمَاءِ '(ক্বিয়ামতের দিন) সবার পূর্বে মানুষের মাঝে যে বিষয়ের ফায়ছালা করা হবে তা হল হত্যা' *(বুখারী হা/৬৮৬৪)*।

প্রাণী জীবকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা ও ইসলাম :

স্বাভাবিক মৃত্যু এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। হত্যা যেভাবেই করা হোক, এটা যে কতটুকু কষ্টদায়ক তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বলতে পারে না। আর জীবন্ত জ্বলেপুড়ে মৃত্যুবরণ করা কী পরিমাণ যন্ত্রণাদায়ক তা প্রকাশের ভাষা মানবজাতির নেই। এজন্য আগুন দিয়ে শাস্তি প্রদান করা কারো জন্য সঙ্গত নয়। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম, আমরা একটি পিঁপড়ার গর্ত জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। এটা দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ. 'এ গর্তটি কে জ্বালাল? আমরা জবাব দিলাম, আমরা জ্বালিয়েছি। তখন তিনি বললেন, আগুনের মালিক (আল্লাহ) ছাড়া আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া কারো জন্য সঙ্গত নয়' *(আবুদাঊদ হা/২৬৭৫, সনদ ছহীহ)*। পশুপ্রাণীকে আগুনে পুড়িয়ে মারা ইসলামে নিষেধ। তাহলে আমরা কিভাবে পেট্রোলবোমায় মানুষেকে পুড়িয়ে মারতে পারি। শুনুন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা। তিনি বলেন, وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللَّهُ 'আল্লাহ ছাড়া কেউ আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে পারবে না' *(বুখারী হা/৩০১৬)*। তিনি আরো বলেন, لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ 'তোমরা আল্লাহ্র আযাব দ্বারা কাউকে আযাব দিবে না' *(বুখারী হা/৩০১৭)*।

অঙ্গহানি ও অঙ্গবিকৃতি ইসলামে নিষিদ্ধ :

হরতাল-অবরোধ, ক্রসফায়ার ও পেট্রোলবোমায় অনেকের জীবন মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে, কিন্তু যে প্রাণে বেঁচে যায়, তাকে দীর্ঘদিন দহনযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আর বিকৃত বীভৎস

আকৃতি নিয়ে বাঁচতে হয়। অথচ মানবাকৃতির বিকৃতি সাধন ইবলীস শয়তানের প্রতিজ্ঞারই প্রতিফলন। আল্লাহ বলেন, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ 'তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই পথভ্রষ্ট করব ও প্রলোভন দেব এবং তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই নির্দেশ দিব, ফলে তারা জন্তু জানোয়ারের কান ছেদন করবে এবং অবশ্য অবশ্য নির্দেশ দিব সে আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তন করবে' *(নিসা ৪/১১৯)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ আনছারী (রাঃ) বলেন, نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ 'নবী করীম (ছাঃ) লুটতরাজ করতে এবং জীবকে বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন' *(বুখারী হা/২৪৭৪)*।

মানুষের চলাচল বাধাগ্রস্ত করা ও ইসলাম :

আমরা গণতন্ত্রের অধিকার আদায়ের নামে আজ হরতাল-অবরোধ দিয়ে মানুষের চলাচল বাধাগ্রস্ত করছি, যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। অথচ হরতাল-অবরোধের নামে জনসাধারণের চলাচলে কষ্ট দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَوْدَنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ 'ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং সর্বনিম্ন হল রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫)*। রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো শুধু ঈমানের অংশই না; বরং এটা একটি ছাদাক্বাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করাও ছাদাক্বাহ' *(বুখারী হা/২৭০৭)*।

সংকট উত্তরণের উপায় :

মৃত্যুপুরীর বিভীষিকা মোকাবেলায় সরকার ও বিরোধী দলের সংকট উত্তরণের জন্য তিনটি পথ খোলা। (১) শক্তির বদলে শক্তি প্রয়োগ করে অশুভ শক্তি দমন। (২) সংলাপ ও সমঝোতার পথে হাঁটা এবং (৩) নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া না করা। তবে প্রথমটি সম্ভব নয়। কারণ আগুন দিয়ে আগুন নিভানো যায় না। দ্বিতীয়টি সংলাপ ও সমঝোতা। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে সংলাপ ও সমঝোতা হবে সে বিষয়ে কোন আলোকপাত নেই। আলোচনায় বসে যদি এক পক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবী করে আর অন্য পক্ষ যদি বর্তমান সরকারের অধীনে ২০১৯ সালে নির্বাচনের পক্ষে অনড় থাকে তাহলে আলোচনা ব্যর্থ হবে। ফলে সংঘাতের রাজনীতি আরো মারাত্মক আকার ধারণ করবে।

অতএব দেশের সংঘাতময় পরিস্থিতিকে শান্তিতে পরিণত করার জন্য উভয় পক্ষকে 'ছাড়ে'র মানসিকতা তৈরি করতে হবে। কবির ভাষায় বলতে হয় 'দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে'। আলোচনার আগে দু'পক্ষকেই স্বীকার করতে হবে, যেকোন সমঝোতাই পৌঁছানো হবে; অনড় অবস্থান থেকে সরে এসে মাঝামাঝি এক জায়গায় দাঁড়াতে হবে। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাটা কারো জন্য পরাজয় হবে না। কেননা এটা হবে মানবতার জন্য, শান্তির জন্য। ইসলামও এ শিক্ষা বহু পূর্বেই প্রদান করেছে। বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন,

لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لاَ تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ كُنْتَ رَسُولاً لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ امْحُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا أَنَا بِالَّذِى أَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِه .

'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হুদায়বিয়াতে (মক্কাবাসীদের সঙ্গে) সন্ধি করার সময় আলী (রাঃ) উভয় পক্ষের মাঝে এক চুক্তিতে লেখেন। তিনি লিখলেন, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। মুশরিকরা বলল, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লিখবে না। আপনি রাসূল হলে আপনার সঙ্গে লড়াই করতাম না? তখন তিনি আলীকে বললেন, 'ওটা মুছে দাও'। আলী (রাঃ) বললেন, আমি তা মুছব না'। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজ হাতে তা মুছে দিলেন' *(বুখারী হা/২৬৯৮)*।

আর তৃতীয়টি নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া না করা। পৃথিবীতে যত মানুষ হক্ব হতে বিরত থেকেছে তার অন্যতম মৌলিক কারণ হল নেতৃত্ব। রোম সম্রাট হক্ব জেনেছিল, কিন্তু নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে তা গ্রহণ করেনি। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই নেতৃত্বের জন্য মুনাফিকী করেছে সারা জীবন। তাই এই নেতৃত্ব নিয়ে আমরা যদি ঝগড়া না করি তাহলে দেশে শান্তি অবশ্যই ফিরে আসবে। তার বাস্তব নমুনা হল মদীনা রাষ্ট্র। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ ছিল আক্বাবার বায়'আত। এই বায়'আতের মাধ্যমে ইসলামী বীজের উন্মেষ ঘটে। বায়'আতে কুবরার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে শুনিয়ে দেন, যাতে তারা নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া না করে। উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) বায়'আতে আক্বাবায় এই মর্মে শপথ নিয়েছিলেন যে, وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ 'আমরা নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া করব না' *(বুখারী হা/৭০৫৬)*।

ইসলামের এই শিক্ষা অনুযায়ী সরকার ও বিরোধী জোটকে বলব, দেশের অসহায় মানুষের দিকে তাঁকিয়ে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনুন। নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া করবেন না। কে ক্ষমতায় থাকল আর কে ক্ষমতা হারাল তার দিকে লক্ষ্য রাখবেন না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানব যদি 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটা কেটে ইসলামের জন্য সন্ধি করতে পারেন তাহলে আপনারা পারবেন না কেন। মনে রাখবেন ক্ষমতায় বসানোর মালিক আল্লাহ। আবার ছিনিয়ে নেওয়ার মালিকও আল্লাহ। অতএব বাড়াবাড়ি করবেন না। আল্লাহ বলেন, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'বলুন হে আল্লাহ! আপনিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন, যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত করেন। আপনারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল' *(আলে ইমরান ৩/২৬)*।

উপসংহার :

পরিশেষে বলব, আমরা যতই টকশো, আলোচনা, সমালোচনা ও লেখালেখির মাধ্যমে উত্তরণের বিভিন্ন পথের কথা বলিনা কেন ইসলামই একমাত্র প্রকৃত সমাধান। সুতরাং ইসলামের নিকটেই এর সমাধান খুঁজতে হবে। এই পৃথিবীর সংঘাতময় রাজনীতিতে একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শই পারে সমাধান আনতে ও শান্তির স্বর্গরাজ্যে পরিণত করতে। বিখ্যাত অমুলিম চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক জর্জ বার্নাড'শ বলেন, I belive that if a man like win where to assume the dictatorship of the modern world. He would succeed in solving its problems in a way that would bring it much needed peace and happiness.

[লেখক : ছাত্র, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

ওমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-এর রাজ্য শাসন

-বযলুর রহমান

ভূমিকা :

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা, কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিবিদ, ইসলামী খেলাফতের দীর্ঘ সময়ের মুহতারাম আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) ছিলেন ন্যায়-সততা, একনিষ্ঠতা, আল্লাহভীরুতা ও মুসলিম রাজ্য শাসনের উঁজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তারুণ্যদীপ্ত ও সাহসীকতার মানদণ্ডে বিশাল ঔদার্য্যের অধিকারী, সুনিপুন কর্মপন্থা আর একাগ্রচিত্ততার গভীরতায় তিনি হয়ে আছেন বিশ্ব মুসলিমের আশার প্রদীপ। তিনি ছিলেন হক্ব ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী, যার কারণে তিনি 'আল-ফারূক' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। মুসলিম রাজনীতিবিদরা রাজনীতির ক্ষেত্রে একমাত্র আশ্রয়স্থল হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে ওমর (রাঃ)-কেই গ্রহণ করে থাকে। তিনি আশারায়ে মুবাশ্শরার মধ্যে অন্যতম একজন ব্যক্তি। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মানিত শশুর ও অর্ধজাহানের খলীফা। নিম্নে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর জীবনের ছিটেফোঁটা আলোকপাত করতঃ তাঁর রাজ্য শাসনের দুর্লভ ইতিহাস বিবরণ উল্লেখ করা হল।

ওমর (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

◈ নাম ও বংশপরিচয় :

প্রকৃত নাম ওমর। কুনিয়াত আবু হাফছ। উপাধী আল-ফারূক।[৬৫] তিনি মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের প্রসিদ্ধ দশটি গোত্রের মধ্যে অন্যতম আদী গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। আদীর

মোররা নামক অন্য এক ভাই ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সপ্তম ঊর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন। এই হিসাবে ফারূকের অষ্টম পূর্বপুরুষে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়েছে। ওমর (রাঃ)-এর পিতার নাম ছিল খাত্তাব।[৬৬] তিনি কুরাইশ বংশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। খাত্তাব বিভিন্ন অভিজাত পরিবারে অনেকগুলো বিবাহ করেছিলেন। তন্মধ্যে 'গানতামাহ' ছিলেন ওমর (রাঃ)-এর মাতা। তিনি কুরাইশ বংশের প্রসিদ্ধ সেনাপতি হিশাম ইবনু মুগীরার কন্যা ছিলেন।[৬৭]

◈ জন্ম পরিচয় :

সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, তিনি হস্তি বছরের ১৩ বছর পরে জন্ম গ্রহণ করেন।[৬৮] কিন্তু তাঁর বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-এর সূত্রে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। একদা আমর ইবনুল 'আছ কয়েকজন বন্ধুবান্ধব সহ বসে আসেন। এমন সময় একটি হৈচৈ শব্দ শুনতে পান। পরে জানা গেল যে, খাত্তাবের একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে। এ ঘটনার উপর ভিত্তি করেই মনে করা হয় যে, ওমর (রাঃ)-এর জন্মের সময় বেশ একটা আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

◈ যৌবনকাল :

যৌবনের প্রারম্ভে ওমর (রাঃ)-এর পিতা তাঁকে উষ্ট্রচারণ কাজে নিযুক্ত করেন। এটি আরবের জাতীয় জীবনে শ্রেষ্ঠ কর্ম বলে বিবেচিত হত। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর পিতা তাঁর উপর নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করত। তাঁকে সারাদিন কাজ করতে হত। কোন সময় একটু বিশ্রাম নিলেও তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হত। যে মাঠে তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করতেন তার নাম 'যাজনান'।[৬৯] ওমর ফারূক (রাঃ)-এর খেলাফতকালে একবার তিনি এই মাঠ অতিক্রম করছিলেন। তখন বাল্যকালের সেই দুঃখজনক স্মৃতি স্মরণ হয়। তখন তিনি অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে লাগলেন,

لا إله إلا الله العلي العظيم المعطي ما شاء لمن شاء. كنت أرعى إبل الخطاب بهذا الوادي في مدرعة صوف وكان فظاً يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت وقد أمسيت ليس بيني وبين الله أحد.

'নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ছাড়া আল্লাহু আকবার! এমন এক সময় ছিল যখন আমি পশমী জামা পরে এই মাঠে প্রখর রৌদ্রতাপের প্রচণ্ড দাবদাহে উট চরাতাম। যখন ক্লান্ত হয়ে একটু বসতে যেতাম, তখই পিতৃহস্তে নির্মমভাবে প্রহৃত হতাম। কিন্তু আজ আমার এমন দিন এসেছে যে, আমার উপর এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মালিক নেই'।[৭০]

তিনি যৌবনের শুরুতেই অভিজাত আরবদের অবশ্যিকভাবে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো যেমন যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা ও বংশ তালিকা শিক্ষায় ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। আল্লামা বালাযুরী (রহঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির সময় সমস্ত কুরাইশ বংশে মাত্র সতেরজন মানুষ লেখাপড়া জানতেন। তাদের মধ্যে ওমর (রাঃ)ও ছিলেন একজন'।[৭১]

---

৬৫. ইবনু সা'দ, ত্বাবাকাতুল কুবরা ৩/২৬৫ পৃঃ; নাফসুল মাছদার ১/১৫ ও ১৩১ পৃঃ।

৬৬. নাসাবু কুরায়শ লিযযুবাইর, পৃঃ ৩৪৭।

৬৭. আওলিয়াতুল ফারূক লিসসিয়সিয়া, পৃঃ ২২।

৬৮. তারিখুল খুলাফা লিসসুয়ূতী, পৃঃ ১৩৩।

৬৯. এটা মক্কার নিকটবর্তী 'ক্বাদীদ' নামক স্থান হতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

৭০. তারীখ ইবনু আসাকির ৫২/২৬৯ পৃঃ।

৭১. ড. আলী আহমাদ আল-খত্বীব, ওমর ইবনু খাত্তাব হায়াতিহি ইলমিহি ওয়া আদাবিহি, পৃঃ ১৫৩; ড. মুহাম্মাদ আহমাদ আবু নাছর, ওমর ইবনু খাত্তাব, পৃঃ ৮৭।

◈ ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ :

ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করা হয়। অথচ তাঁর ইসলাম গ্রহণের মৌলিক ঘটনা অধিকাংশেরই অজানা।

৬ষ্ঠ নববী বর্ষের শেষ দিকে যিলহজ্জ মাসে আরব জাহানের অন্যতম তেজস্বী ও পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ইসলাম গ্রণহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন চল্লিশতম মুসলিম। যা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশেষ দো'আর বরকত। হাদীছে এসেছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) দো'আ করেছিলেন, اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِأَبِى جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ. 'হে আল্লাহ! আবু জাহল ইবনু হিশাম অথবা ওমর ইবনুল খাত্তাব দ্বারা তুমি ইসলামকে শক্তিশালী কর'। এই দো'আর পরদিন ওমর ভোরে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কা'বা গৃহে গিয়ে প্রকাশ্যে ছালাত আদায় করেন।[৭২] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ওমর (রাঃ) ইসলাম কবুল করেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও গৃহবাসীগণ এমন জোরে তাকবীর ধ্বনি করেছিলেন যে, মসজিদুল হারাম পর্যন্ত তা পৌঁছে গিয়েছিল।[৭৩]

◈ ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মানসিক অবস্থা :

ইসলাম গ্রহণের পরেই তিনি ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন আবু জাহলের গৃহে গমন করেন এবং তার দরজায় জোরে করাঘাত করেন। তখন আবু জাহল বের হয়ে এসে বলল, أهلا وسهلا ما جاء بك؟ 'স্বাগতম, তোমার আসার কারণ কী?' ওমর (রাঃ) দ্বিধাহীনচিত্তে তার মুখের উপর বলে দিলেন, 'আমি তোমার কাছে এসেছি এ খবর দেওয়ার জন্য যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর ঈমান এনেছি এবং তিনি যে শরী'আত এনেছেন তা সত্য বলে জেনেছি'। তখন আবু জাহল রাগান্বিত হয়ে গালি দিয়ে বলে উঠল, 'আল্লাহ তোমার মন্দ করুন এবং তুমি যে খবর নিয়ে এসেছ তার মন্দ করুন'। অতঃপর সে দরজা বন্ধ করে ভিতরে চলে গেল।[৭৪]

◈ নির্যাতনের মাত্রা শুরু :

ওমর ফারূক (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে লোক জমা হয়ে সকলেই ওমরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গণপিটুনী শুরু করে। এই মারপিট চলে প্রায় দুপুর পর্যন্ত। এ সময় কাফিরদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'যদি আমরা সংখ্যায় তিনশ' পুরুষ হতাম, তবে দেখাতাম এরপর মক্কায় তোমরা থাকতে না আমরা থাকতাম'। এই ঘটনার পর নেতারা হত্যা করার উদ্দেশ্যে ওমরের বাড়ী আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি ঘরের মধ্যেই ছিলেন। কিন্তু 'আছ ইবনু ওয়ায়েল সাহমীর প্রচেষ্টায় লোকজন সেখান থেকে ফিরে গেলে ওমর (রাঃ) রাসূলের খিদমতে হাযির হয়ে বললেন,

يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا قال بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم قال قلت ففيم الاختفاء والذي بعثك بالحق لنخرجن.

'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কী হক্বের উপরে নই? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, নিশ্চয় তোমরা সত্যের উপর আছ, যদি তোমরা মৃত্যুবরণ কর কিংবা জীবিত থাক'। ওমর (রাঃ) বললেন, 'তাহলে লুকিয়ে থাকার প্রয়োজন কী! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম করে বলছি, অবশ্যই আমরা প্রকাশ্যে বের হব'।[৭৫] অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মাঝখানে রেখে দুই সারির মাথায় ওমর ও হামযার নেতৃত্বে মুসলিমগণ প্রকাশ্যে মিছিল সহকারে মসজিদুল হারামে উপস্থিত হলেন।

◈ 'আল-ফারূক' উপাধি প্রদান :

উক্ত ঘটনার পরই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে 'ফারূক' (الفاروق) বা 'হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী' উপাধিতে ভূষিত করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, ما كنا نقدر ان نصلي عند الكعبة حتي اسلم عمر وقال ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر 'ওমরের ইসলাম গ্রহণের আগ পর্যন্ত আমরা কা'বা গৃহের নিকট ছালাত আদায় করতে সক্ষম হইনি'। তিনি আরো বলেন, 'ওমরের ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমরা সর্বদা শক্তিশালী ও সম্মানিত ছিলাম'। ছুহায়েব বিন সিনান আর-রূমী (রাঃ) বলেন, 'ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম তার গোপন প্রকোষ্ঠ থেকে বাইরের জগতে প্রকাশ্য রূপ লাভ করে। মানুষকে ইসলামের দিকে প্রকাশ্যে আহ্বান জানানো সম্ভব হয়। আমরা গোলাকার হয়ে কা'বা গৃহের পাশে বসতে পারতাম এবং ত্বাওয়াফ করতে পারতাম। যারা আমাদের উপর কঠোরতা দেখায় তাদের প্রতিশোধ নিতাম এবং তাদের কোন কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতাম'।[৭৬]

◈ ওমর (রাঃ)-এর ফযীলত ও মানাক্বিব :

ওমর (রাঃ) ছিলেন সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী ও মুমিনদের প্রতি অতীব দয়ালু। পক্ষান্তরে কাফের, বেদ্বীন ও অনৈসলামিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর। শয়তান তাঁকে দেখলে ভিন্ন পথে চলে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ '(হে ওমর!) যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, শয়তান তোমাকে যে পথে চলতে দেখে, সে তোমার রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরে'।[৭৭]

ন্যায়পরায়ণ, সাহসী ও বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর ফারূক (রাঃ)-এর খেলাফত আমলে মুসলিম জাহানে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে তিনি যে বিরাট অবদান রেখেছেন তা ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। তাঁর শাসনামলে মানুষ সর্বত্র সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করেছেন। তিনি ছিলেন খুবই দূরদর্শী এবং

---

৭২. আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৬০৩৬, 'মানাক্বিব' অধ্যায় ৩০ 'ওমর (রাঃ)-এর মানাক্বিব' অনুচ্ছেদ ৪, সনদ হাসান ছহীহ।

৭৩. আর রাহীকুল মাখতূম, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১০৪, আত-তাহরীক ১৪/২ নভেম্বর ২০১০, পৃঃ ৪।

৭৪. আর-রিয়াযুন নাযরাত, পৃঃ ৩১৯।

৭৫. হিলয়াতুল আওলিয়া ১/৪০ পৃঃ; ছিয়াতুছ ছাফাওয়াত ১/১০৩-১০৪ পৃঃ।

৭৬. আর রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১০৫; বুখারী হা/৩৮৬৩; ফাযায়েলুছ ছাহাবা ১/৩৪৪ পৃঃ ।

৭৭. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬০৩৬।

প্রজাহিতৈষী। জনসাধারণের অবস্থা জানার জন্য তিনি রাত্রিতে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি এক রাতে একটি ছোট্ট কুটিরের সামনে এলে বাড়ীর ভিতরের কথাবার্তা শুনতে পেলেন। মা মেয়েকে আদেশ করছেন, দুধের সাথে পানি মিশাও। ভোর হয়ে এল। মেয়েটি উত্তর দিল, 'না মা, ওমর (রাঃ) দুধে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন। তিনি জানতে পারলে শাস্তি দিবেন'। মা বললেন, 'ওমর দেখতে পেলে তো'? মেয়ে বলল, 'আমি প্রকাশ্যে তাঁর আনুগত্য করব আর গোপনে তাঁর অবাধ্যতা করব? আল্লাহ্‌র কসম! এটা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সে বলল, 'ওমর (রাঃ) হয়ত আমাদেরকে দেখছেন না, কিন্তু তাঁর প্রভুতো আমাদেরকে দেখছেন'! গোপনে সব শুনে ওমর (রাঃ) বাড়ীটি চিহ্নিত করে ফিরে এলেন। পরে তাঁর ছেলে 'আছেমের সাথে ঐ মেয়ের বিবাহ দিলেন। তারই গর্ভে দু'টি কন্যা সন্তান জন্মলাভ করেছিল, যাদের একজনের গর্ভে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর জন্ম হয়েছিল।[৭৮] যিনি দ্বিতীয় ওমর বলে পরিচিত।

◈ ওমর (রাঃ)-এর চারিত্রিক আদর্শ :

ইসলামী চরিত্রের বিকাশ সাধন ওমর (রাঃ)-এর অন্যতম প্রধান কীর্তি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পৃথিবীবাসীকে অত্যন্ত উন্নত ও পবিত্র চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছেন। মূলতঃ তাঁর জীবনযাত্রার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল উত্তম চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন। তিনি বলেন, بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ 'সচ্চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি'।[৭৯]

ওমর (রাঃ)-এর অনুপম চারিত্রিক প্রভাবে জাতির সেই উন্নত চরিত্র পুনরায় রক্ষিত হয়েছিল এবং যে সমস্ত নতুন নতুন রাজ্য ইসলামে দিক্ষিত হয়েছিল তাদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে এর প্রসার লাভ করেছিল। স্বয়ং ওমর (রাঃ) ছিলেন ইসলামী চরিত্রের এক সাক্ষাৎ প্রতিরূপ। তাঁর অপূর্ব নিষ্ঠা, আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরাগ, দুনিয়ার ভোগবিলাস পরিহার, বাক্যের সত্যতা ও সত্যানুরাগ প্রভৃতি উন্নত গুণগুলো মানুষের মনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলত এবং যে কোন ব্যক্তি কিছু দিন তাঁর সহচার্যে থাকলে আপনাতেই এই সমস্ত গুণাবলীতে সেও গুণান্বিত হত। ফালিল্লা-হিল হামদ।

প্রচলিত বদঅভ্যাসের মূলোৎপাটন

ইসলাম আগমনের পরেও আরবজাতির মধ্যে কতিপয় বদঅভ্যাস বিদ্যমান ছিল। বংশ গরিমা, আত্মম্ভিরতা, সাধারণ মানুষকে ঘৃণা করা, মানুষকে অপমান করা, গালি দেওয়া, উচ্ছৃঙ্খলতা, মদ্যপান ইত্যাদি ছিল অন্যতম। আমীরুল মুমিনীন ওমর ফারুক (রাঃ) এ সমস্ত বদঅভ্যাসগুলো অত্যন্ত কঠোরহস্তে দমন করেন। যেখানেই গর্ব ও অহংকারের বাহ্যিক আলামত পরিলক্ষিত হত সেখানেই তা নিশ্চিহ্ন করে দিতেন।

◈ প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে পার্থক্যকরণ :

আবহমান কাল থেকে প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে চরম পার্থক্য চলমান। বর্তমান কালের প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যকার পার্থক্য আইয়ামে জাহেলিয়া যুগকেও হার মানায়। অথচ ইসলামী ইতিহাসের দ্বিতীয় খলীফা এবং অর্ধ জাহানের অধিপতি ও সম্রাট ওমর (রাঃ) এই জঘন্য অপরাধকে একেবারে নির্মূল করেন। যেমন- একদা ছাফওয়ান ইবনু উমাইয়া কিছু গণ্যমান্য লোকদের সাথে ওমর (রাঃ)-কেও দাওয়াত করেছিলেন। কিন্তু সেখানে খাওয়ার সময় তাদের সাথে ভৃত্যদের না বসানোর কারণে তিনি অত্যন্ত দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ঐ সমস্ত লোকদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন, যারা তাদের চাকরদেরকে ঘৃণা করে'। অতএব সাবধান, হে ভৃত্যের প্রভুগণ!

◈ পারস্পরিক কুৎসা রটনাকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিতকরণ এবং শাস্তি নির্ধারণ :

জাহেলী যুগে অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক তুলকালাম ঘটে যেত। একে অপরের মর্যাদাহানী করত, অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করে কুৎসা রটনা করত। আর কুৎসা রটনার একমাত্র বাহন ছিল কবিতা। কেননা সেযুগে আবর জাতি আরবী সাহিত্যে বিশ্ব জয় করেছিল। তাদের অনেকেই কবিতা চর্চা করত। যা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ফলে অল্প সময়েই তা সকলের নিকটে পৌঁছে যেত। এ কারণে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটত। এমনকি মারামারি-খুনোখুনি থেকে যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াত। কিন্তু ওমর (রাঃ) এই কুৎসা রটনাকে মারাত্মক অপরাধ বলে চিহ্নিত করেন এবং তার জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেন। যেমন হাতিয়া (রাঃ) তখনকার দিনে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। কিন্তু ওমর (রাঃ) তাকে কিছুদিন বন্দি করে রাখেন। অতঃপর এই শর্তে মুক্তি দেন যে, ভবিষ্যতে আর কোনদিন কুৎসামূলক কবিতা রচনা করতে পারবেন না।[৮০]

উল্লেখ্য আরবীয়দের চিরাচরিত বদঅভ্যাস, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবৈধ প্রেমের প্রধান মাধ্যম ছিল কবিতা। কবিরা তাদের নিজ নিজ প্রেমিকার নাম উল্লেখ করে অত্যন্ত নগ্ন ও অশ্লীল ভাষায় কবিতা লিখতেন। আর প্রচলিত রুচি বা প্রথা অনুযায়ী সে কবিতাগুলো যুবক-বৃদ্ধ সকলের আনন্দের বাহন হিসাবে পরিগণিত হত। ফলে কুরুচি, নগ্নতা, বেহায়পনা উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজে ব্যাপকতা লাভ করত। ওমন ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এই সমস্ত কবিতার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় নির্দেশ প্রদান করেন যে, 'কোন কবিই নারীর প্রতি প্রেম নিবেদন করে অথবা অন্য কোনভাবে নারীদের উল্লেখ করে কোন কবিতা লিখতে পারবে না। যদি কেউ তা করে থাকে, তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে'।

◈ মদ্যপানের শাস্তি নির্ধারণ :

মদ্যপানের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় ওমর ফারূক (রাঃ) প্রচলিত

মদ্যপানের শাস্তি আরো দ্বিগুণ করে দেন। চল্লিশ বেত্রাঘাতের পরিবর্তে আশি বেত্রাঘাতের প্রচলন করেন। সম্ভবতঃ একারণেই জয়-বিজয়ের এত প্রসার এবং ধন-দৌলতের এত প্রাচুর্য সত্ত্বেও জনসাধারণের মধ্যে আরামপ্রিয়তা ও ভোগবিলাসিতার কোন স্থান পায়নি। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রবর্তিত সরল ও পবিত্র জীবন-প্রণালী তাঁর জীবনে আমৃত্যু অক্ষুণ্ণ ছিল। *[ক্রমশঃ]*

[আল্লামা শিবলী নু'মানী প্রণীত 'আল-ফারূক' গ্রন্থ অবলম্বনে]

---

৭৮. তারীখু মাদীনাতি দিমাশক্ব ৭০/২৫৩।
৭৯. হাকেম হা/৪২২১, সনদ ছহীহ ।
৮০. হাকেম ১/১৬৮ ও ১/১৮৯-১৯০ পৃঃ ।

প্রসঙ্গ : হলুদ সাংবাদিকতা ও ইহূদীদের বিশ্ব মিডিয়া কব্জা

-মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম

ভূমিকা :

সংবাদপত্রকে সমাজের দর্পণ বলা হলে সাংবাদিকরা হচ্ছেন তার পারদ। তাই সমাজের প্রকৃত দৃশ্যের জন্য একটি সুন্দর আয়নায় সত্যিকার প্রতিবিম্ব অবলোকন করতে সাংবাদিকদের ভূমিকা যে অগ্রগন্য, সে কথা না বললেও চলে। পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে জাগ্রত হয়ে কতিপয় আত্মোৎসর্গী মানুষ জীবন বাজি রেখে সাংবাদিকতা করছেন। আবার অনেকেই এই পেশাকে গোপনে বিক্রি করে ডাইনির মত ফোঁকলা দাঁতের হাসি হাসছেন। জাতির সাথে করছেন বিশ্বাসঘাতকতা। নিমিষেই জিরো থেকে হিরো হওয়ার আশায় মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য পরিবেশন করে পুরো জাতিকে বানাচ্ছে বোকা এবং দেশের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছেন। এমনকি এক দেশের সাথে অন্য দেশের বিভেদ সৃষ্টি করছেন। আর এ ষড়যন্ত্রের মূলে রয়েছে ইহূদী জাতির প্রটোকল।

হলুদ সাংবাদিকতার পরিচয় :

ভারতবর্ষের প্রথম 'প্রেস কমিশন' হলুদ সাংবাদিকতার সংজ্ঞায় এভাবে বলেন- 'হলুদ সাংবাদিকতা হল, অসত্য জেনেও বিদ্বেষপরায়ণ সংবাদের ইচ্ছাকৃত মুদ্রণ; কোন ছোট্ট ঘটনাকে

কেন্দ্র করে একটি বিরাট মিথ্যার জাল বোনা; ব্যক্তিগত জীবনের ঘনিষ্ঠ ঘটনা, যার সঙ্গে পাঠকের স্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই, তা প্রকাশ, বীভৎস্য সংবাদ কিংবা কারও ব্যক্তিক জীবনের অনধিকার প্রবেশের সংবাদ প্রকাশ, জনসাধারণের রুচিকে ইচ্ছাকৃত বিকৃত করা, অশ্লীল ভাষা এবং অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যবহার'।[৮১] এক কথায় বেপরোয়া কায়দায় চমকপ্রদ কিংবা চঞ্চল সংবাদ ছাপিয়ে পাঠককে উসকানি দেওয়া বা উত্তেজিত করার নামই হলুদ সাংবাদিকতা।

Wikipedia-তে হলুদ সাংবাদিকতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- Yellow Journalism or the yellow press, is a type of journalism that presents little or no legitimate well-researched news and instead uses eye-catching headlines to sell more newspaper. Techniques may include exaggerations of news events, scandal-morning, or sensationalism. By extension, the term yellow journalism is used today as a pejorative to decry any journalism that treats news in an unprofessional or unethival fashion.

অর্থ 'হলুদ সাংবাদিকতা বা হলুদ প্রেস হল, যেখানে সাংবাদিকেরা ছোট বা অবৈধ কোন সংবাদকে চোখ ধাঁধাঁনো শিরোনাম করে, যাতে বেশী বেশী সংবাদপত্র বিক্রি হয়। বিভিন্ন কৌশল খাটিয়ে ঘটনাকে অতিরঞ্জন করাই সংবেদনবাদ, এই শব্দটা সম্প্রসারিত হয়ে হলুদ সাংবাদিকতায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা যেমনি নিন্দাকর ও মূল্যহীন, তেমনি যে কোন অপেশাদার সাংবাদিকের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে'।

উল্লেখ্য, হলুদ সাংবাদিকতা শব্দটি প্রথমে পাঠককে আকর্ষণ এবং বেশী বিক্রির জন্যে রোমাঞ্চকর সংবাদ ও উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ ছাপাতে ১৮৯০ সালে 'নিউইয়র্ক সিটি 'এবং 'বিশ্ব ও সংবাদ' পত্রিকা দু'টিতে প্রকাশ পায়'।

হলুদ সাংবাদিকতার আবির্ভাব :

মূলতঃ হলুদ সাংবাদিকতার সূতিকাগার হচ্ছে আমেরিকা। যদিও হলুদ সাংবাদিকতার জন্মদাতা ইহূদীরা। ১৮৯৫ সালে নিউইয়র্ক থেকে 'সানডে জার্নাল' নামে দু'টি পত্রিকা প্রকাশিত হত। প্রথমোক্ত পত্রিকাটি 'দি ইয়েলো ফিড' শিরোনামে একটি হাসির ছবির সিরিজ প্রকাশ করত। অতঃপর শেষোক্ত পত্রিকাটিও এ ধরনের ছবি প্রকাশ করা আরম্ভ করে। শুরু হয় প্রতিযোগিতা। কে কত আষব-গুষব মার্কা খবর ও ফিচার প্রকাশ করতে পারে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে মিথ্যা বানোয়াট খবর পরিবেশন করার মাধ্যমেই শুরু হয় হলুদ সাংবাদিকতার যাত্রা। তথ্য পরিবেশনের চেয়ে তাদের উদ্দেশ্য হয় হীন সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য। পথিকৃৎ হচ্ছে, স্যামুয়েল হকপিন্স, অ্যাডামস, লিংকন, স্টিমোন্স এবং অ্যাডাম টারবেল নামের বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিকরা। এ প্রকৃতির সাংবাদিকদের তখনকার আমেরিকান সুশীল সমাজ 'গোবরে পোকাদে'র (journalism of muckworm) সাংবাদিকতা বলতেন। ফলে হলুদ সাংবাদিকতাকে লুফে নেয় ইহূদীরা। বিশ্বের সংবাদপত্রকে কিভাবে নিজেদের কব্জায় আনা যায়, সেটা তাদের চিন্তার একমাত্র খোরাকে পরিণত হয়। তারা তখন বিরোধী পক্ষকে প্রতিহত করতে সিদ্ধান্ত নেয় শত্রুদের কাছে এমন কোন সংবাদপত্র থাকতে দেবে না, যার মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে।[৮২]

১৮৮৯ সালে নিউইয়র্কের 'ওয়ার্ল্ড' পত্রিকাটি 'হোগানের গলি' শিরোনামে এক ধরনের ব্যঙ্গাত্মক রচনা ও ছবি প্রকাশ করত। এর বিষয় ছিল শহরের জনাকীর্ণ অঞ্চলের বসতবাড়িগুলোর জীবনযাত্রা দেখান। ১৮৯৩ সালে যখন মুদ্রণ সংবাদপত্রে প্রথম রঙের ব্যবহার শুরু হয়, তখন 'ওয়ার্ল্ডে'র মুদ্রণ বিভাগের একজন নিরীক্ষা হিসাবে 'হোগানের গলি'র ঐ ব্যঙ্গচিত্রের এক শিশুর গায়ে খানিকটা বেশিই হলুদ রঙ ঢেলে দিয়েছিলেন। সুতরাং পাঠকের সামনে ঐ হলুদ রঙ হাযির হল তুমুল চমক হিসাবে। অন্যান্য পত্রিকার পাঠকও তাদের নির্দিষ্ট পত্রিকা ছেড়ে যুক্ত হলেন 'ওয়ার্ল্ডে'র সঙ্গে। ব্যস! ওয়ার্ল্ডের বিক্রি বাড়তে লাগল হু-

৮১. দৈনিক আমাদের সময়, ২৯ নভেম্বর ২০১৪, পৃঃ ৪।

৮২. দৈনিক ইনকিলাব, ২৭ জুলাই ২০১১, পৃঃ ৮।

হু করে এবং 'হোগানের গলি'র ওই গরিব শিশুটি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল এক হলুদ রঙেই।

অন্যদিকে নিউইয়র্কের আরেক সংবাদপত্র 'জার্নাল' তখন 'ওয়ার্ল্ডে'র সঙ্গে কোনভাবেই প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে 'ওয়ার্ল্ডে'র প্রায় সব সাংবাদিককেই বেশি বেতনে তাদের পত্রিকায় নিয়ে নেয়। সবচেয়ে বেশি বেতন হয় 'হোগানের গলি'র রচয়িতা আউটকল্টের। অতঃপর 'ওয়ার্ল্ডে'র অনুকরণে অন্যান্য পত্রিকা হলুদ রঙের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করতে থাকল। প্রতিযোগিতা ছড়িয়ে পড়তে লাগল পত্রিকার অন্যান্য পৃষ্ঠায়ও। কে কত বেশি লোমহর্ষক খবর ছাপাতে পারে, কে কত বেশি পাঠককে উসকানি দিতে পারে, উত্তেজিত করতে পারে, শুরু হল তার দৈনন্দিন লড়াই। খুন-খারাপি, যৌনতা ও হিংসাত্মক খবরের প্রতি পাঠকের সাধারণ কৌতূহলকে পুঁজি করে শুরু হল হলুদ সাংবাদিকতার অগ্রযাত্রা। মূল ঘটনার ক্ষীণ সূত্র ধরে সংবাদে দেওয়া হত অতিরঞ্জন। প্রথম পৃষ্ঠার অর্ধেকের বেশি জুড়ে বিশাল শিরোনাম, বীভৎস্য ছবি, খ্যাতিমান চিত্রতারকা কিংবা রাজনীতিকদের ব্যক্তিগত জীবনের যৌনাত্মক বিবরণী ছাপা হতে থাকল সত্যনিষ্ঠ তথ্যসূত্র ছাড়াই। সাথে দেশপ্রেমের নামে মার্কিন পাঠকদের মন ও মাথায় যুদ্ধ উন্মাদনার বীজও গেঁথে দেওয়া হল। ১৮৮৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্পেন যুদ্ধের সমর্থনে মার্কিন জনমত তৈরির পেছনে 'ওয়ার্ল্ড' জার্নালের অবদান তো কম নয়! হলুদ রঙের ঐ রমরমা বাজারের কারণেই 'হলুদ সাংবাদিকতা' শব্দবন্ধনটি চিরদিনের জন্যে অভিধানে তার জায়গা পাকাপোক্ত করে নেই।[৮৩]

PBS-তে হলুদ সাংবাদিকতার আবির্ভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে- The term yellow journalism came from a popular New York World comic called "Hogan's Alley," which featured a yellow-dressed character named the "the yellow kid." Determined to compete with Pulitzer's World in every way, rival New York Journal owner William Randolph Hearst copied Pulitzer's sensationalist style and even hired "Hogan's Alley" artist R.F. Outcault away from the World. In response, Pulitzer commissioned another cartoonist to create a second yellow kid. Soon, the sensationalist press of the 1890s became a competition between the "yellow kids," and the journalistic style was coined "yellow journalism."

অর্থ 'হলুদ সাংবাদিকতা শব্দটি এসেছে নিউইয়র্কের কমিকধর্মী জনপ্রিয় পত্রিকা 'হোগানের গলি'র হলুদ পোশাকের চরিত্রের নাম 'হলুদ ছাগলছানা' থেকে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিশ্বে উইলিয়াম র‍্যান্ডলফ হার্স্টের রোমাঞ্চকর পদ্ধতি এবং 'হোগানের গলি'র এই কথা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয় পুলিৎযার। পুলিৎযার আরও বলেন, অন্য একজন কার্টুনিস্ট সৃষ্টি করল 'হলুদ ছাগলছানা'। ১৮৯০ সালের দিকে 'হলুদ ছাগলছানা' নিয়ে রোমাঞ্চকর প্রেসগুলো প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করল এবং সাংবাদিকদের স্টাইল উদ্ভাবন হল হলুদ সাংবাদিকতা'।

Encyclopedia Britannica-তে হলুদ সাংবাদিকতার আবির্ভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যোসেফ পুলিৎযার ১৮৮৩ সালে নিউইয়র্ক 'ওয়ার্ল্ড' ক্রয় করে এবং রংয়ের ব্যবহার, রোমাঞ্চকর সংবাদ, খারাপ রাজনীতি ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে দেশের বড়বড় পত্রিকার সার্কুলেশন করে। ১৮৯৫ সালে যখন পুঁজিপতির পুত্র ঐশ্বর্যশালী উইলিয়াম র‍্যান্ডলফ হার্স্ট প্রকাশ করল, তখন নিউইয়র্ক শহর যেন ঘুরে গেল। হার্স্টের এই পত্রিকাটি পরীক্ষামূলক হলেও সফল ও পরিপূর্ণভাবে সঞ্চরণশীল পেপারে পরিণত হল। শীঘ্রই একইভাবে সে নিউইয়র্ক শহরের বাহিরে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল সংবেদনবাদ, ক্রুসেডস এবং রবিবারের প্রবন্ধ পত্রিকাগুলোতে। পুলিৎযার ক্রয় করে নিল ফ্রান্সিসকোর কিছু ছন্দোবিশেষণ স্টাফকে এবং রিকার্ড এফসহ কাগজগুলোর ঠিকাদারকে। আউটকল্ট যিনি কার্টুনিস্ট এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় কমিক ছবির সিরিজ, হলুদ ছাগলছানা, রবিবারের বিশ্বে আঁকত। আউটকল্টের দলত্যাগের পর যিনি বিশ্বব্যাপী কমিক এঁকেছিলেন। লিকস্ এবং দু'টি প্রতিদ্বন্দী ছবির সিরিজ যা যথেষ্ট প্রভাবশালী দু'টি সংবাদপত্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা সৃষ্টি করল তাই হলুদ সাংবাদিকতা। এই সম্পূর্ণ প্রতিদ্বন্দী এবং এর উন্নতি উভয় কাগজের বৃহৎ সার্কুলেশন ছড়িয়ে পড়ল আমেরিকার প্রত্যেকটি শহরে। সেই থেকে হলুদ সাংবাদিকতা সংক্ষিপ্তভাবে চলতে থাকল। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতা আকারে ছড়িয়ে পড়ল। সময়ের প্রভাবে কিছু কলাকৌশল পরিবর্তন, সংযোজন অথবা বিয়োজন আকারে ব্যাপকভাবে শিরোনাম, রঙ্গিন কমিক এবং অন্য মিডিয়া বিশেষ করে টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটে অনেক সংবেদনশীল আকারে ছড়িয়ে পড়ে'। আর এভাবেই হলুদ সাংবাদিকতা বিকাশ লাভ করে।

হলুদ সাংবাদিকতার শিকার কিছু ঘটনার নমুনা :

সুধী পাঠক! এই হলুদ সাংবাদিকতার প্রভাবে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে মুহূর্তের মধ্যে কেউ হয়েছে হিরো এবং কেউ হয়েছে জিরো। কোন কোন সংবাদপত্র তথ্য বিকৃতি ও গোপন করে বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র প্রতিপন্ন করতে উঠে পড়ে লেগেছিল; এখনো তেমনি রাষ্ট্রঘাতি প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে কোন কোন পত্র-পত্রিকা। এদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতার ঘটনাগুলোকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাংলাদেশকে 'সন্ত্রাসের আঁতুরঘর' সাব্যস্ত করে এক ধরনের আতঙ্কবাজিতে লিপ্ত হয়েছে তারা। এ দেশের বিকাশমান প্রবৃদ্ধির শিল্পবাণিজ্যের উদ্যোক্তাদের চরিত্র হনন করে, দেশের প্রবৃদ্ধি ও সম্ভাবনাগুলোকে খাটো করে দেখিয়ে জাতি ও রাষ্ট্রকে পরমুখাপেক্ষী করার প্রয়াস পেয়েছে। শুধু গৌরিপুরের খবর নয়, ঢাকায় সাংবাদিক মহাসমাবেশের খবরও তথ্যসন্ত্রাসী সংবাদপত্রগুলোতে গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। যদিও পরবর্তীতে অনুসন্ধান ও বিভিন্ন সত্য তথ্য প্রকাশ হলে এর মূল ঘটনা জানা যায়। ততদিনে জনগণের মাঝে হলুদ সাংবাদিকতার প্রভাবে মূল ঘটনার বিকৃত রূপ প্রকাশ পেয়ে গেছে। আর

৮৩. দৈনিক আমাদের সময়, ২৯ নভেম্বর ২০১৪, পৃঃ ৪।

ইতিহাস বিকৃতির মত আসল ঘটনা আড়ালে থেকে গেছে। তাই চেপে রাখা কিছু ঘটনার নমুনা নিম্নে প্রকাশ করা হল।

নমুনা-১ : ঘটনার সূত্রপাত 'নিউইয়র্ক টাইমসে' প্রকাশিত তাদের এক খুদকুঁড়ো চাঁটা সাংবাদিকের বিলাসী রিপোর্ট থেকে। উন্মুখ চিহ্নিত মহলের পদলেহী সাংবাদিকমহল এটাকে লুফে নেয় মহাসুযোগ হিসাবে। একে কেন্দ্র করে ফলাও করে প্রচার হতে থাকে ইসলামী মৌলবাদের ভয়াবহতার গালগল্প। অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হয় বগুড়ার গাবতলী থেকে জঙ্গী তৎপরতার অভিযোগে গ্রেফতারকৃত শফিকুল্লাহর প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক নাটকীয় জবানবন্দী। যা ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ তারিখে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মুস্তাফিযুর রহমানের নিকট ১৬৪ ধারায় গ্রহণ করা হয়। এই জবানবন্দীতেই প্রথম সন্ত্রাসবাদের সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবরী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের নাম যুক্ত হয় এবং তার নেতৃত্বাধীন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নামক সংগঠন দু'টি ব্যাপকভাবে মিডিয়ার নযর কাড়ে। আর এ দশকের শ্রেষ্ঠতম বিস্ময়রূপে হলুদ সাংবাদিকতার কল্যাণে রাতারাতি আবিষ্কৃত হয় ডঃ গালিব নামের ভয়াবহতা।[৮৪]

সুধী পাঠক! জোরপূর্বক জঙ্গী বানিয়ে নিরীহ লোকদের উপর হয়রানি ও যুলুমের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। একশ্রেণীর রাজনৈতিক দল ও সংবাদ মাধ্যমের এ বিষয়ে প্রচারণা ও উস্কানিকে বাড়াবাড়ি বলে অভিহিত করেছে বিভিন্ন পেশার ও শ্রেণীর মানুষ। কতিপয় পত্র-পত্রিকায় মিথ্যা প্রচারণার মুখে বারবার বলে আসছিল বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের কোন অস্তিত্ব নেই; কিন্তু হঠাৎ করে 'জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ' (জেএমজেবি) ও 'জামা'আতুল মুজাহেদীন বাংলাদেশ' (জেএমবি) নামের দু'টি সংগঠন নিষিদ্ধ করার তথ্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সংগঠন দু'টিকে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি সরকার একদিকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর আমীর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবসহ বেশ কয়েকজন কথিত জঙ্গীকে গ্রেফতার করেছিল। অন্যদিকে বিস্ময়কর এক প্রেস নোটের মাধ্যমে স্বীকার করে নিয়েছিল যে, বাংলাদেশে সত্যিই ইসলামী মৌলবাদী সংগঠন রয়েছে এবং সশস্ত্র জঙ্গীরা কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারী ইস্যুকৃত প্রেসনোটে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, 'জেএমবি' ও 'জেএমজেবি' নামের সংগঠন দু'টি ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে খুন, ডাকাতি, বোমা হামলা ও হুমকিসহ নানাবিধ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে শান্তিপ্রিয় জনগণের জীবন ও সম্পদহানি করে আসছে। সংগঠন দু'টির বিরুদ্ধে তরুণকে বিপথগামী করার অভিযোগও উত্থাপন করা হয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে, কথিত সংগঠন দু'টির সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার আগেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে গ্রেফতার করা হয়। প্রেসনোটে তার গ্রেফতারের জন্য পুলিশকে তাদের তৎপরতা আরো জোরদার করার নির্দেশ দেয়া হয়।[৮৫]

নমুনা-২ : দেশে একযোগে ৬৩ টি যেলায় বোমা হামলার পর মিডিয়া তদন্তের নামে তারা সত্য-মিথ্যা রং-ছড়ানো খবর-অখবর ছাপিয়ে একটা মহাসঙ্কটের চিত্র রচনা করে। এ সম্পর্কে হুঁশিয়ারী করে চিন্তাবিদ ফরহাদ মাযহার লিখেছেন, তাতে আতঙ্কিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে বোমাবাজদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে দেয়া। তাদেরই উপকার যারা ইসলামকে বর্বর, হিংস্র ও অসভ্যদের ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বাংলাদেশকে মৌলবাদের ঘাঁটি হিসাবে প্রমাণ করে বাংলাদেশে মার্কিন, ইহূদী ও হিন্দুত্ববাদী শক্তির সামরিক হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করতে চায়। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে যদি প্রমাণ করা যায়, বাংলাদেশ সশস্ত্র ও সন্ত্রাসী ইসলামী মৌলবাদীদের ঘাঁটি, তাহলে অকার্যকর রাষ্ট্র ঘোষণা করে এবং ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার ধুয়া তুলে রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের সার্বভৌম অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিয়ে মার্কিন ইহূদী ও হিন্দুত্ববাদী অক্ষশক্তির পক্ষে একটি 'তত্ত্বাধায়ক সরকার' গঠন করা সহজ হয়। আমরা কাগজে কলমে রাষ্ট্র থাকলাম কিন্তু কার্যত হয়ে পড়লাম মার্কিন-ইহূদী-হিন্দুত্ববাদের রক্ষিতা দেশ....।[৮৬]

নমুনা-৩ : বাংলাদেশে যমুনা বহুমুখী সেতুতে ফাটল ধরার খবরের কথা সবাই জানেন। তবে সম্ভবত খুব কমজনই ফাটলের প্রকৃত কারণ জানেন। 'পোর্টল্যাণ্ড গ্রেড' সিমেন্ট ব্র্যান্ডের নামে ছাই সদৃশ 'ফ্লাই অ্যাশ' মিশ্রিত নিম্ন গ্রেডের সিমেন্ট ব্যবহার করায় এই ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। নিম্ন গ্রেডসম্পন্ন এই সিমেন্ট অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এই প্রকল্পে যাওয়ার কারণ হল ঐ সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক ট্রান্সকমের লতিফুর রহমান। 'ডেইলি স্টার' আর 'প্রথম আলো'কে ভয় পাওয়ায় সরকারের কেউ 'হোলসিম' সিমেন্টের বিরুদ্ধে কোন শব্দই উচ্চারণ করে না। পত্রিকা দু'টি দেশের সবচেয়ে প্রচলিত দৈনিক। আর এগুলো প্রকাশনার মূল উদ্দেশ্য হল কর্পোরেট অপরাধের ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা। 'ডেইলি স্টার' গ্রুপের প্রধান উদ্দশ্য হল বিভিন্ন ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ী গ্রুপের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া। 'ডেইলি স্টার' গ্রুপের দেশবিরোধী ভূমিকার সর্বশেষ নযির হল দিনাজপুরে বাংলাদেশের একমাত্র কঠিন শিলা প্রকল্প। মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পটি গত কয়েক বছর ধরে 'ডেইলি স্টার' গ্রুপের শিকার হয়েছে। জানা গেছে, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার এবং ভারতের পাথর এবং পাথরজাত সামগ্রী আমদানিকারকসহ স্বার্থান্বেষী মহল 'ডেইলি স্টার'-কে মিডিয়া সন্ত্রাসের মদদ দিচ্ছে। এই ধরনের আত্মঘাতি ভূমিকায় আসলে কয়েক মিলিয়ন ডলারের সম্পদ রক্ষা পাচ্ছে না; বরং বঞ্চিত হচ্ছে বিশ্বমানের গ্রানাইট টাইলস্ রফতানির মাধ্যমে কয়েক মিলিয়ন ডলার আয়ের সুযোগ থেকে। ২০০৬ সালের ১৮ মে 'ডেইলি স্টার' আবারো 'পেট্রোবাংলা টু টেক অভার ফ্রম ডিপিআরকে ফার্ম' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে 'ডেইলি স্টার' ২০০৮ সালের ১৬ মে আবারো প্রথম পৃষ্ঠায় 'মাইনার নাও অ্যান্টস রিটার্ন অব নন-এক্সিস্টেন্ট লোন' শীর্ষক খবর প্রকাশ করে'।[৮৭]

নমুনা-৪ : সম্প্রতি প্রতিরক্ষা বাহিনী নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হচ্ছে। প্রতিরক্ষা বাহিনী সম্পর্কে জনগণ ও মিডিয়ার আগ্রহেরই প্রতিফলন এটি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অনেক পত্রিকায় বিভ্রান্তিকর লেখা ছাপা হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ সামরিক বিষয়ে যারা লিখছেন তাদের এ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব। যে কারণেই হোক না কেন, আমাদের দেশে ডিফেন্স রিপোর্টার হিসাবে তেমন কোন ক্যারিয়ার এখনো গড়ে উঠেনি। ফলে

৮৪. দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ মার্চ ২০০৫।
৮৫. দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৫, পৃঃ ১ ও ৭।
৮৬. দৈনিক আমারদেশ, ২৪ আগস্ট ২০০৫, পৃঃ ৬।
৮৭. দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৭ এপ্রিল ২০১০, পৃঃ ৪।

ডিফেন্স বিষয়ে রিপোর্টিংয়ে আপত্তিকর ভুল দেখা যায়। এটা বিভিন্ন মহলে বিতর্ক সৃষ্টি করে। এরকমই একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে 'প্রথম আলো' পত্রিকায়। প্রতিবেদনটি নিজস্ব মতাশ্রয়ী এবং পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। প্রতিবেদক মীযানুর রহমান খান হয়তো বিশেষ উদ্দেশ্যে এটা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছেন। তাছাড়া এমনও হতে পারে, প্রতিরক্ষা বিষয়ে তার জানার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে তার উচিত ছিল সামরিক বাহিনীর মতো বিশেষ সংস্থার প্রচলিত নিয়মনীতি ও প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামাদি বিষয়ে কোন লেখা তৈরির আগে এ সম্পর্কে ভালো করে জেনেশুনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা, যা তিনি করেননি। এজন্যই তার প্রতিবেদনটি বিভিন্নভাবে পাঠককুলে মতানৈক্যের সৃষ্টি করেছে।[৮৮]

নমুনা-৫ : উইকিলিকস 'বাংলাদেশ, র‍্যাবের জনপ্রিয়তা বনাম মানবাধিকারের মরীচিকায় ক্রসফায়ার' সম্পর্কে বলেন, র‍্যাবের জনপ্রিয়তা ও সমালোচনার প্রধান কারণ তথাকথিত 'ক্রসফায়ার'। জুডিথ শামাসের ঐ তারবার্তায় বলা হয়, বাংলাদেশের দুর্বল আইন প্রয়োগ কাঠামোতে বিতর্কিত 'র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন' একটি জনপ্রিয় অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে অপরাধ দমনে প্রধানত 'ক্রসফায়ার' নির্ভর পদক্ষেপের ফলপ্রসূতার কারণে'। উক্ত তারবার্তাটিতে উল্লেখ করা হয়, ২০০৪ সালের জুন থেকে ২০০৫ সালের জুলাই পর্যন্ত ক্রসফায়ারে ১১৭ জন সন্দেহভাজন অপরাধীকে হত্যা করেছে র‍্যাব। ২০০৫ সালের ২১ ডিসেম্বর জুডিথ শামাসের লেখা আরেকটি গোপন তারবার্তা থেকে জানা যায়, তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুযযামান বাবর তাকে বলেন যে, ২০০৫ সালে র‍্যাবের ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছেন ১৪৮ ব্যক্তি।[৮৯]

নমুনা-৬ : ভারতের 'আম আদমি পার্টি' (এএপি) নেতা ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দু কেজরিওয়াল দুর্নীতিবিরোধী আদর্শ নিয়ে এএপি গঠন করেছিলেন ২০১২ সালের নভেম্বরে। আর মাত্র ১ বছরের মাথায় দিল্লির বিধানসভায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে কংগ্রেসের সহায়তায় গত বছরের ২৮ ডিসেম্বর গঠন করেন রাজ্য সরকার।[৯০] 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' ও

'এনডি' টিভির খবরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সদস্য সংগ্রহের ঘোষণার পর থেকে গতকাল পর্যন্ত ১০ দিনে প্রায় ৫ লাখ ভারতীয় যোগ দিয়েছেন ভারতের রাজনীতিতে সাড়াজাগানো দল 'আম আদমি পার্টি'তে। আর গতকাল শুক্রবার সদস্য সংগ্রহের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রচারাভিযানের উদ্বোধন করেছেন দলটির প্রধান অরবিন্দু কেজরিওয়াল। এতে তিনি ২৬ জানুয়ারীর মধ্যে মাত্র ১৬ দিনে দলের সদস্যসংখ্যা ১ কোটিতে উন্নীত করার লক্ষ্য স্থির করেছেন।[৯১] কেজরিওয়ালের উত্থান সম্পর্কে বলা হয়, লাউগাছের লকলকিয়ে উঠতে সব সময়ই মাচানের ঠেকনার প্রয়োজন। নইলে কী হয়, কারও তা অজানা নয়। দল মতভেদ থাকলেও অরবিন্দু কেজরিওয়ালকে সেই ঠেকনার নির্ভরতা কংগ্রেস আগ বাড়িয়ে দিয়েছে। কেন দিল? একটা কারণ নরেন্দ্র মোদির বাড়বাড়ন্তে ব্রেক কষা। অন্য কারণ রাজনীতির আঁতুড়ঘরের এই নবজাতকটিকে মোক্ষম রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া, যাতে তার স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হয়ে কত ধানে কত চাল সেটা অতি দ্রুত বুঝতে পারে। মোক্ষম কারণটি সম্ভবত টিম কেজরিওয়ালকে ক্ষমতার অলিন্দে টেনে এনে অচিরেই লোভী করে তুলে গোটা দলকে সততা ও নীতির উচ্চ সোপান থেকে মাটিতে আছড়ে ফেলা, যাতে 'আমরা অন্য রকমের' ঘোষণাটি খানখান হয়ে ভেঙে পড়ে মুড়ি ও মুড়কি একাকার হয়ে যায়।[৯২]

২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাস। প্রতিবেশি ভারতের পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। লোকসভা নির্বাচন খুব কাছাকাছি। তাই সে বিধানসভার নির্বাচনগুলোকে লোকসভা নির্বাচনের একটি মহড়া হিসাবেই বিবেচনা করা হয়েছে। ঔৎসুক্য ছিল দেশ-বিদেশে। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিল কংগ্রেস ও বিজেপি। কিন্তু দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে একটি তৃতীয় শক্তির আকস্মিক অভ্যুদয় সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। মাত্র এক বছর আগে দলটি গঠিত হয়েছে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও কংগ্রেস সদস্যদের তারা সরকার গঠন করেছে দিল্লিতে। দলটির নাম 'আম আদমি পার্টি'। দলের নেতা অরবিন্দু কেজরিওয়াল। তিনি পরাজিত করেছেন পরপর তিন দফায় নির্বাচিত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, সৎ রাজনীতিক বলে পরিচিত শীলা দীক্ষিতাকে। কংগ্রেস কার্যত নগণ্যসংখ্যক আসন পেয়েছে। বিজেপি আম আদমির চেয়ে তিনটি আসন বেশি পেলেও সরকার গঠনের সুযোগ পায়নি; বিরোধী দলে অবস্থান নিয়েছেন। আম আদমি পাটি যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে কেউ কেউ এসব কর্মসূচী যেমন ৪০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল ৫০% কমানো, দৈনিক ৭০০ লিটার পানি বিনামূল্যে সরবরাহ প্রভৃতি বাস্তবায়নে দিল্লির রাজ্য সরকারের সক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান। এভাবে গণভর্তুকি চালু করলে উন্নয়নমূলক কাজ থমকে যেতে পারে বলেও কারও কারও আশঙ্কা। এসব সন্দেহ ও আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।[৯৩] ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে অংশ নিতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়ার পর গত ১৩ ডিসেম্বর থেকে আবার নতুন করে তহবিল সংগ্রহ শুরু করে। এরপর থেকে প্রতিদিন গড়ে সাড়ে ১৭ লাখ রুপি করে সংগ্রহ করছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। দলটির স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বাড়ছে। ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে সারাদেশ থেকে দলটিতে প্রায় তিন লাখ স্বেচ্ছাসেবক যোগ দিয়েছে। আর এক লাখের বেশী মানুষ হয়েছেন দলটির সদস্য। তাই ভারতীয় রাজনীতির দুই

৮৮. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৮ আগস্ট ২০০৬, পৃঃ ৭।
৮৯. দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ এপ্রিল ২০১২, পৃঃ ১৩।
৯০. দৈনিক আমাদের সময়, ৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৪, পৃঃ ৫।
৯১. দৈনিক আমাদের সময়, ১১ জানুয়ারী ২০১৪, পৃঃ ৫।
৯২. প্রথম আলো, সোমবার, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৩, পৃঃ ১১।
৯৩. দৈনিক প্রথম আলো, বুধবার, ৮ জানুয়ারী ২০১৪, পৃঃ ১০।

প্রভাবশালী দল কংগ্রেস ও বিজেপি আম আদমি পার্টিকে নিয়ে বেশ চিন্তিত।[৯৪]

নমুনা-৭ : হলুদ সাংবাদিকতা কিভাবে জিরোকে হিরো করে এবং রং লাগিয়ে কিভাবে ফুলিয়ে তোলে তার বাস্তব নমুনা হল- গত ১০ অক্টোবর ২০১৪ সুইডেনের নোবেল কমিটি পাকিস্তানের ১৭ বছরের তরুণী মালালা ইউসুফযাইকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে। মালালা হল এযাবৎকালের সর্বকনিষ্ঠ এবং পাকিস্তানের দ্বিতীয় নোবেল জয়ী। ১৯৯৭ সালের ১২ই জুলাই পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকার সিঙ্গোরা গ্রামে মালালার জন্ম। তার পিতা যিয়াউদ্দীন ইউসুফযাই এলাকায় একটি স্কুল চালাতেন। অতঃপর ২০১২ সালের ৯ অক্টোবর স্কুলছাত্রী ১৫ বছরের মালালাকে তালেবানরা গুলি করে। যা তার মুখে ও মাথায় লাগে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব মিডিয়ায় তালেবানের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। অথচ পাকিস্তানের ইংরেজি 'দৈনিক ডন' পত্রিকায় ২০১৩ সালের ১১ অক্টোবর সংখ্যায় 'মালালা : আসল কাহিনী' শিরোনামে যে অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বলা হয় যে, মালালা পাকিস্তানী মুসলিম মেয়ে নয়; বরং ১৯৯৭ সালে পূর্ব ইউরোপের হাঙ্গেরীতে তার জন্ম এক খ্রিস্টান মিশনারী পরিবারে। তার আসল নাম 'জেন'। ২০০২ সালে তার পিতা-মাতা তাকে নিয়ে পাকিস্তানের সোয়াত ভ্রমণে আসেন এবং মালালার বর্তমান পিতা-মাতা গোপনে খ্রীস্টান হয়ে যাওয়ার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে ঐ মিশনারীর পক্ষ হতে জেনকে দান করা হয়। অতপর 'জেন' হয়ে যায় 'মালালা ইউসুফযাই'। তারা জেন-এর বর্তমান উচ্চভিলাষী পিতা যিয়াউদ্দীন ইউসুফযাইকে তাদের স্বার্থে কাজে লাগায় এবং মালালা ও তার কথিত পিতাকে দিয়ে তালেবানদের বিরুদ্ধে নানাবিধ কল্পকথা আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রকাশ করতে থাকে। এভাবে তাদের পরিচিতি তুঙ্গে উঠলে মালালাকে গুলি করা হয় কথিত তালেবানকে দিয়ে। কিন্তু মালালা মরে না। চিকিৎসার নামে তাকে ও তার পরিবারকে উড়িয়ে নেয়া হয় আমেরিকায়। অতঃপর সে এখন হয়ে গেল শান্তিতে নোবেল জয়ী। মালালাকে গুলি করা শ্যুটারের ডিএনএ টেস্ট করে দেখা গেছে যে, সেও মালালার মত বিদেশী রক্তের অধিকারী। সম্ভবত ইতালীর লোক। যাকে দক্ষ তালেবান সাজিয়ে এই হামলা করানো হয়েছে যাতে মালালা না মরে। রিপোর্টে বলা হয়, পাকিস্তানী ও মার্কিন গোয়েন্দা এজেন্সিগুলো যৌথভাবে এই নাটক মঞ্চস্থ করে। 'ডন'-এর এই রিপোর্ট বিশ্বে তোলপাড় সৃষ্টি হলেও হলুদ সাংবাদিকতার দুনিয়ায় পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো এ বিষয়ে নীরব থাকে।[৯৫]

নমুনা-৮ : ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ মঙ্গলবার সকাল-৯ টায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের 'বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র' ১১০ তলা টুইন টাওয়ার ও ওয়াশিংটনের সামরিক প্রতিরক্ষা কেন্দ্র পেন্টাগনে পরপর ৪টি বিমানের আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায়। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাসহ সারা বিশ্বের হাযার হাযার গোয়েন্দা সংস্থা ও সাংবাদিকদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে চোখ বন্ধ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ বলে দিলেন, 'এ হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন'। শুধু তাই নয় ওসামা বিন লাদেনকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার অজুহাতে ০৭ অক্টোবর ২০০১, রবিবার রাতের অন্ধকারে যুক্তরাষ্ট্রে Operation Crusade kabul নামে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তানের উপরে বর্বরোচিত হামলা শুরু করে। অথচ এই ওসামা বিন লাদেন তাদের হাতেই তৈরি। সউদী আরবের জনপ্রিয় আরবী পত্রিকা 'ওকায' গত ১১ সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার জন্য ইসরাঈলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ'কে দায়ী করেছে। 'ওকায' বলেছে, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে হামলার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৬ জন সন্দেহভাজন ইসরাঈলীকে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেফতার করা হলেও পরে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। যেখানে টুইন টাওয়ারে ৬ হাযার ইহূদী চাকুরী করত সেখানে এ ঘটনার দিন একজন ইহূদীও অফিসে যাননি। কি কারণে তারা অফিসে গেল না? কে তাদের তথ্য দিল যে আজ টুইন টাওয়ারে হামলা হবে? এসব বিষয়ে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কোন তথ্য না নিয়ে ঘটনার জন্য সরাসরি 'আল-কায়েদা'-কে জড়িত করা হল। আর হলুদ সংবাদিকতার প্রভাবে সে কথায় তারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিল এবং নিরীহ ও নিরপরাধ আফগানিস্তানের উপর হামলা চালান হল। গত শতাব্দীর আশির দশকে তারা তাদের প্রতিপক্ষ রুশদেরকে আফগানিস্তানের উপর লেলিয়ে দেয়। অন্যদিকে স্বাধীনচেতা আফগানদেরকে অস্ত্র দিয়ে তাদের মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়াকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মিটিয়ে দেয়। ৯০-এর দশকে বর্তমান বুশ এর পিতা সিনিয়র বুশ ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে লেলিয়ে দেয় কুয়েতের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে নিজে ত্রাণকর্তা সেজে কুয়েত ও সঊদী আরবের মাটিতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ করে নেয়। অথচ এই ইরাকে মরণাস্ত্র আছে এই অজুহাতে সেখানে আক্রমণ করল এবং পবিত্র ঈদের দিনে সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। অথচ তারা আজ পর্যন্ত সে দেশে কোন অস্ত্রের সন্ধান পায়নি।[৯৬]

নমুনা-৯ : ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামী ফ্যাসিজমের নামে নিশ্চিত পরিকল্পনার কথা যত দ্রুত ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, তার চেয়েও দ্রুতগতিতে গ্রেফতার করা হয়েছে ২৪ জনকে। বুশকে টনি ব্লেয়ার তার চেয়েও দ্রুততম সময়ে ঘটনাটি অবহিত করেছেন। অস্বাভাবিক অল্প সময়ের মধ্যে সারাবিশ্বে একটি তটস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। ইশারা-ইঙ্গিতে নয়, সরাসরি বলা হচ্ছে কাজটা করেছে মুসলিমরা। ইরাক ও আফগানিস্তানে হামলার সময় বিশ্বজনমতকে মৌলবাদীভীতি, লাদেন ট্রাম্পকার্ড, তালেবান সরকার সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে রাখা সম্ভব হয়েছিল। আমরাও পশ্চিমা প্রতারণা বুঝতে পারিনি। প্রগতিবাদী সাজতে গিয়ে বুশের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কথিত মৌলবাদের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী কোরাসে গলা মিলিয়েছি। সাম্রাজ্যবাদের পাতা ফাঁদে

৯৪. টাইমস অব ইন্ডিয়া, জি নিউজ, এবিপি, দৈনিক যায়যায়দিন, শুক্রবার, ৩ জানুয়ারী ২০১৪, পৃঃ ১৩।

৯৫. মাসিক আত-তাহরীক, ১৮তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ডিসেম্বর ২০১৪, সম্পাদকীয় দ্র.।

৯৬. দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ অক্টোবর ২০০১, মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০০১, পৃঃ ৪০।

পা দিয়ে বগল বাজিয়েছি। ভেবেছি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ আসলেই সঠিক। যখন সত্য জানলাম এবং বুঝলাম, তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। তখন জনমতকে কতগুলো শব্দ ও মিথ্যা তথ্যের আড়ালে এমনভাবে বিষিয়ে তোলা হয়েছিল যেন তালেবান-মৌলবাদ মানে রাক্ষস-খোক্কস। ভয়াবহ বিপদগ্রস্ত জনপদ। তালেবান যোদ্ধারা দ্রুত ধেয়ে আসছে ইউরোপের দিকে, গ্রাস করবে গোটা ইউরোপ; এই বুঝি পশ্চিমা সভ্যতার টুটি চেপে ধরতে যাচ্ছে তালেবানি ভূত। তার আগেই আমেরিকা ত্রাতার ভূমিকায় নেমে বিশ্বকে রক্ষা করল।

অন্যদিকে আল-কায়েদা এবং ওসামা বিন লাদেন মানে এমন এক বিভীষিকা, লাদেনের তসবির দানা, মাথার পাগড়ি, গায়ের আলখেল্লা, প্রলম্বিত দাড়ি সব যেন এক একটি পরমাণু বোমা। এই বুঝি মার্কিন সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দেবে কিংবা গিলে খাবে। জনগণের পিলে চমকে দিয়ে সাদ্দামকে বানান হল রাবনের মত দানব, অসুর এবং মানবতাবিধ্বংসী মারাত্মক অস্ত্রের মালিক। তাইতো আফগানিস্তান ট্রাজেডি, ইরাক আগ্রাসন, সাদ্দাম ইস্যু, লাদেন প্রসঙ্গ, মৌলবাদের ধূম্রজাল, গুয়ানতানামো বের ঘটনা, সিরিয়া ও ইরানকে শাসানোর প্রক্রিয়া, গাযায় প্রত্যক্ষ মদদদান, লেবাননে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার পর সবার দৃষ্টি তখন খুলতে শুরু করেছে।[৯৭]

নমুনা-১০ : আমরা পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলোর কথায় প্রথমে চিন্তা করি; মুসলিম বিশ্বের বাইরের কোন সন্ত্রাসী আক্রমণের কথা যখন খবরে প্রকাশ করা হয়, তখন (উত্তর আয়ারল্যান্ডের) আইআরএ চরমপন্থী বা বিচ্ছিন্নতাবাদীরা গ্রেনেড ছুঁড়েছে, এভাবে প্রকাশ করা হয়- বিশ্লেষণগুলো হয় এক ধরনের। এমনকি ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে, টোকিও-এর পাতাল রেলে বিষাক্ত সারিন গ্যাস ব্যবহার করে যে হত্যাযজ্ঞ চালান হয় তাকেও পশ্চিমা গণমাধ্যমে কেবল চরমপন্থী গোষ্ঠীর কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে; কোন ধর্মের গোড়া সমর্থক গোষ্ঠীর বলে আখ্যায়িত করেনি। অপরদিকে নিকট বা প্রাচ্যে বা আলজেরিয়ায় যদি কেউ একটা গ্রেনেড ছুঁড়ে থাকে, তবে সেই কাজের দায়ভার 'গোড়া মুসলিম' বা মুসলিম মৌলবাদদের উপর চাপানো হবে। যদিও কাজটা কোন আরব খ্রিস্টানের বা নাস্তিক ব্যাপ্টিস্ট পার্টির সদস্যদেরও হয়। হফম্যান বলেন, 'গণমাধ্যমগুলো বাধা-ধরা ধ্যান-ধারণার বেড়াজালে আটকা পড়ে আছে বলে মনে হয়। বিশেষতঃ তারা যখন কোন গোলযোগের সাথে ইসলামকে একটা ধর্ম হিসাবে সম্পৃক্ত করে, তাদের ভাব দেখে মনে হয় যেন অপরাপর ধর্মীয় গোষ্ঠীর চেয়ে হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতি ইসলামের একটা স্বাভাবিক আসক্তি রয়েছে'। ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের কার্যকলাপকে যখন একজন মুসলিমের কার্যকলাপ বলে ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তখন আমরা একটা লেখা খুঁজে পাই না কেন? যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের গগণচুম্বী অপরাধ সংঘটিত করার জন্য গোঁড়া খ্রিস্টান স্ট্যালিনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে অথবা নাৎসী জার্মানীতে সংঘটিত অপরাধের জন্য ক্যাথলিক এড লফ হিটলারকে অভিযুক্ত করা হয়েছে? মুসলিমদের প্রসঙ্গ না ওঠা পর্যন্ত, পশ্চিমা মিডিয়া তাদের খ্রিষ্টান পরিচিতিকে উহ্য রেখে থাকে। আসলে সত্যিই কি কেউ এই সত্য উদঘাটিত করতে ইচ্ছুক যে, ইতিহাসে কাদের অধ্যায় বেশী রক্তরঞ্জিত? খ্রিষ্টান না মুসলিমদের?[৯৮] পশ্চিমা মিডিয়া মুসলিমদের ঢালাওভাবে 'মৌলবাদী' বলে গালাগালি করে। এ প্রসঙ্গে হফম্যান পশ্চিমাদের ভণ্ডামী উন্মোচন করে লেখেন, 'ক্যাথলিক সংস্থা, প্রয়াত ফরাসী আর্চবিশপ প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন, ইসরাঈলী একত্রিতকরণ পন্থীগণ ও নিউইয়র্কের খ্রিষ্টান অনুসারীগণ, উত্তর আয়ারল্যান্ডে ক্যাথলিক এবং প্রস্টেট্যান্ট সন্ত্রাসীগণ অথবা দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গী ক্যাথলিক লিবারেমন থিয়োলজিস্টস- এদের কারও নামের সাথে ফান্ডামেন্টালিস্ট বা মৌলবাদী লেবেল এটে দেয়া হয় না। হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যবহৃত এই 'মৌলবাদী' লেবেলটি কেবল মুসলিমদের নাজেহাল করার জন্য সংরক্ষিত।[৯৯] পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো ইসলাম ও মুসলিমদের হেয় প্রতিপন্ন করতে নারী বিষয়ে জঘন্য মিথ্যাচার করে থাকে। এনজিওগুলো পশ্চিমাদের এজেণ্ডা পূরণে কাজ করছে। হফম্যান নারী অধিকার বিষয়ে বলেন, 'এটা কি করে সম্ভব যে এমন একটি মানুষ (নবী ছাঃ) তার বাণীতে নারী বিদ্বেষ প্রচার করবেন? তথাপি পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম প্রসারের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হচ্ছে এই কুসংস্কারমূলক কুৎসা, যা আজ একটি প্রচার যান্ত্রিকশিকারে পরিণত হয়েছে যে, মুসলিম সমাজ না-কি নারী ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরীপন্থী, যেখানে তারা পাকঘরের বাক-স্বাধীনতাহীন বন্দীমাত্র'।[১০০]

নমুনা-১১ : ধনবাদী সম্প্রদায়ের নেতা সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশকে সমগ্র বিশ্ব যে 'বিশ্বসন্ত্রাসী' আখ্যায় চিহ্নিত করেছে তাও কারো আজ অজানা নয়। কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্য ধ্বংস করে সে এখন তার কল্পনাশ্রিত তথাকথিত 'ইসলাম' ধর্মের রূপকে সন্ত্রাসের লেবাস পরিয়ে মুসলিমদের ওপর নানারূপ যুলুম নির্যাতনে নেমে পড়েছে। এ বিষয়টি নানাভাবে ধনবাদী প্রভাবিত পত্রপত্রিকা 'ইসলাম' ধর্মকেই চিত্রিত করতে নিবদ্ধ হয়েছে 'সন্ত্রাসী ধর্ম' হিসাবে- এসবও সাধারণ পাঠকের চোখ এড়ায় না। মধ্যযুগীয় ক্রুসেডের রূপকে তথাকথিত ক্রীশ্চান ধর্মীয়রা অধুনা যুগেও তাদের অধিগত আণবিক অস্ত্রের জোরে, নীরিহ মুসলিম রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে এবং তাদের বিরুদ্ধবাদীদের ধ্বংস করার নানা চক্রান্তে মেতে উঠেছে। এই যে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ এটাও মিডিয়া প্রভাবিত। 'ইসলাম' কার্যকর হলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হবে, সমানাধিকার, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হবে, ব্যক্তি বিশেষের, শ্রেণী বিশেষের (কৌলিণ্য অনুসারে) শোষণ-সমৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হবে, জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে দুর্নীতি সমাজরন্ধ্রে প্রবেশের পথ পাবে না, দারিদ্র হবে বিদূরিত। তাহলে ধনতন্ত্র আর ভণ্ড এলিট-সম্প্রদায় যাবে কোথায়? অবশ্যই জাহান্নামে! দরিদ্রজনেরা না থাকলে ধনিকশ্রেণীর প্রবল পরাক্রম প্রাসাদে, বিলাসে, লাম্পট্যে, বিভ্রান্তিতে, অন্যায়-অবিচারে, অত্যাচারে পরিপুষ্ট হবে কেমন করে? দরিদ্র যারা সমাজে সৃষ্টি করছে তারা কি চায় মানবসমাজ থেকে দারিদ্রতা ঘুচে যাক! সংবাদপত্র কি পাঠকদের এইসব শিক্ষা দেয়? কিন্তু সংবাদপত্রও তো এসব কথা প্রচারে অপ্রতিরোধ্য![১০১] *(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)*

[লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, জয়পুরহাট যেলা]

---

৯৭. নয়াদিগন্ত, শুক্রবার, ১৮ আগস্ট ২০০৬, পৃঃ ৭।

৯৮. হফম্যান, পৃঃ ৩০-৩১ ।

৯৯. হফম্যান, পৃঃ ৩৫ ।

১০০. ইসলাম দি অলটার, পৃঃ ২৮৮।

১০১. দৈনিক ইনকিলাব, রবিবার, ০৪ জুন ২০০৬, পৃঃ ৩৮।

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক যুগ : ২য় পর্যায় (খ)

জিহাদ আন্দোলন (২য় পর্যায়)

আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও পরবর্তী যুগ (১২৪৬-১৩৭০/১৮৩১-১৯৫১), ১২০ বৎসর : ১৮৩১ সালের ৬ই মে শুক্রবার বালাকোট বিপর্যয়ের পর বেঁচে যাওয়া প্রায় ৭০০শ গাযী পার্শ্ববর্তী বান্সীর এলাকার সর্দার বাহরাম খানের বাড়ীতে সমবেত হয়ে শায়খ অলি মুহাম্মাদ ফল্তীকে ৮ই মে তারিখে নতুন 'আমীর' নির্বাচন করেন ও সকলে তাঁর হাতে বায়'আত করেন।[১০২] এই সময় মাওলানা বেলায়েত আলী (১২০৫-৬৯/১৭৯০-১৮৫২ খৃঃ) সৈয়দ আহমাদের নির্দেশক্রমে দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদকে কেন্দ্র করে[১০৩] এবং মাওলানা এনায়েত আলী (১২০৭-৭৮/১৭৯২-১৮৫৮ খৃঃ) বাংলাদেশের হাকিমপুরকে (বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা যেলার অন্তর্ভুক্ত) কেন্দ্র করে জিহাদ সংগঠনে ব্যস্ত ছিলেন। তবে 'তাযকেরা'-র বর্ণনা মতে এটি ১২৪৮ হিঃ মোতাবেক ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ হ'তে পারে।[১০৪] অতঃপর ১৮৪৩ সালে মাওলানা এনায়েত আলী প্রথম 'আমীর' নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রে পর পর পাঁচজন 'আমীর' নিযুক্ত হন।[১০৫] এই সময় উল্লেখযোগ্য কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। তবে সিত্তানা মূল মুজাহিদ ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যা ১৮৪১ সালে সিন্ধু নদীর বন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।[১০৬]

১-মাওলানা এনায়েত আলীর ১ম ইমারত (১২৫৯-৬২/১৮৪৩-৪৬ খৃঃ) : ১৮৩৯ সালে রণজিৎ সিংয়ের মৃত্যুর পরে শিখদের গৃহদ্বন্দ্বের সুযোগে হাযারা ও কাগান এলাকার পাঠান সর্দারগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং মাওলানা বেলায়েত আলীকে ইমারত গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান।[১০৭] মাওলানা তাঁর খলীফা ও মেজভাই এনায়েত আলীকে বাংলাদেশ হ'তে সীমান্তে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এনায়েত আলী বাংলাদেশ হ'তে দু'হাযার মুজাহিদ নিয়ে প্রথমে পাটনা কেন্দ্র ও পরে সীমান্তে রওয়ানা হন এবং ১৮৪০ সালে কাগান (বালাকোট) পৌঁছে গেলে[১০৮] সকলে তাঁর নিকটে 'আমীরে জিহাদ' হিসাবে বায়'আত করেন।

আমীর হওয়ার পর ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে শিখদের উৎখাত করে তিনি বালাকোট জয় করেন।[১০৯] অতঃপর ১৮৪৬ সালের মার্চ মাসে শিখদের মযবুত কেল্লা ফত্হগড় জয় করে তার নাম 'ইসলামগড়' রাখেন ও তাকে রাজধানী করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন,[১১০] যার সীমানা নওশেরা হ'তে সিকান্দারপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।[১১১]

২- মাওলানা বেলায়েত আলীর ইমারত (১২৬২-৬৯/১৮৪৬-৫২ খৃঃ) : ইসলামগড়ে স্বাধীন ইসলামী হুকুমত কায়েম হওয়ার পর বড় ভাই মাওলানা বেলায়েত আলী (১২০৫-১২৬৯/১৭৯০-১৮৫২ খৃঃ)-কে আমন্ত্রণ করে এনে ২৪শে শাওয়াল ১২৬২ হিঃ মোতাবেক ১৮৪৬ সালের ১৬ই অক্টোবর জুম'আর পূর্বে মেজভাই মাওলানা এনায়েত আলী স্বীয় ইমারতের গুরুদায়িত্ব বড়ভাইকে অর্পণ করেন।[১১২]

বেলায়েত আলী আমীর হওয়ার তিন মাস পরেই কাশ্মীরের শাসক গোলাম সিং ডোগরাশিখদের এক বিরাট বাহিনীর সাথে 'দুর্রা দুব' নামক স্থানে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। কিন্তু পাঠান সর্দারদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই যুদ্ধে মুজাহিদগণের সাক্ষাত বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়।[১১৩] এইভাবে নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমতের মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি ঘটে। মাওলানা আওলাদ আলী আযীমাবাদী কিছু সংখ্যক মুজাহিদকে নিয়ে সিত্তানা ঘাঁটিতে ফিরে যেতে সক্ষম হ'লেও বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলী গ্রেফতার হয়ে ইংরেজের সরকারী ছত্রছায়ায় প্রথমে লাহোর ও পরে আযীমাবাদ প্রেরিত হন ও সেখানে মুচলেকার বিনিময়ে দু'ভাইকে নযরবন্দী রাখা হয়।[১১৪] মেয়াদ শেষে পুনরায় দু'ভাই ৮ই রবীউছ ছানী ১২৬৭ হিঃ মোতাবেক ১৮৫১ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী সিত্তানার ঘাঁটিতে পৌঁছে যান[১১৫] ও সেখানেই মাত্র বিশ মাস পরে ২২শে মুহর্রম ১২৬৯ হিঃ মোতাবেক ১৮৫২ সালের ৫ই নভেম্বর তারিখে ডিপথেরিয়ায়

মাওলানা বেলায়েত আলী (রহঃ)-এর বংশ তালিকা :

বেলায়েত আলী বিন (২) ফত্হ আলী বিন (৩) ওয়ারেছ আলী বিন (৪) মোল্লা মুহাম্মাদ সাঈদ ওরফে মোল্লা বখ্শ বিন (৫) ক্বাযী আহমাদুল্লাহ বিন (৬) মোল্লা হাফীযুল্লাহ অথবা শুক্রুল্লাহ বিন (৭) মাওলানা মুহাম্মাদ আরিফ বিন (৮) মোল্লা মুহাম্মাদ ইবরাহীম বিন (৯) মোল্লা মুহাম্মাদ মানছূর বিন (১০) আবুল হাসান বিন (১১) আবদুল্লাহ ওরফে 'হাজিউল হারামাইন' বিন (১২) খাজা আলী বিন (১৩) হামীদুদ্দীন বিন (১৪) মাখ্দূম আযীযুদ্দীন শহীদ বিন (১৫) মাখ্দূম খলীলুদ্দীন বিন (১৬) মাখ্দূম ইয়াহ্ইয়া মুনীরী বিহারী বিন (১৭) সুলতান মুহাম্মাদ ইসরাঈল বিন (১৮) মুহাম্মাদ ওরফে 'ইমাম তাজ ফক্বীহ' বিন (১৯) আবু বকর বিন (২০) আবু মুহাম্মাদ ওরফে 'ইমাম আবুল ফতহ' বিন (২১) আবুল ক্বাসেম বিন (২২) আবদুছ ছায়েম বিন (২৩) আবু সাঈদ ওরফে 'মাওলানা আবুদ্ দাহ্র' বিন (২৪) আবুল ফতহ বিন (২৫) ইমাম আবুল লাইছ বিন (২৬) আবুল লাইল বিন (২৭) আবুদ্ দাহ্র বিন (২৮) আবু সাহ্মাহ্ বিন (২৯) আবুদ্ দীন 'ইমামে আলম' বিন (৩০) আবু মাসঊদ (তাবেঈ) বিন (৩১) আবদুল্লাহ (ছাহাবী) বিন (৩২) যুবায়ের (ছাহাবী, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা (রাঃ) বিন (৩৩) আবদুল মুত্ত্বালিব বিন হাশিম বিন আবদে মানাফ। -তাযকেরায়ে ছাদেক্বাহ, পৃঃ ৮-৯।

১০২. গোলাম রসূল মেহের, 'সারগুযাস্তে মুজাহেদীন' (লাহোর : গোলাম আলী এন্ড সন্স, সালবিহীন), পৃঃ ২৬-২৭।

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৫।

১০৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৮; মাসঊদ আলম নাদবী, 'হিন্দুস্তান কি পহেলী ইসলামী তাহরীক' (দিল্লী : মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ২য় প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৮১), পৃঃ ৪৯-৫০; নাদবী বলেন, এই সময় তিনি দিল্লীর আশেপাশে ছিলেন। -ঐ; মৌলবী আবদুর রহীম যুবায়রী, 'তাযকেরায়ে ছাদেক্বাহ' (কলিকাতা : মাতবা'আ ওছমানী, ১ম প্রকাশ ১৩১৯/১৯০১ খৃঃ), পৃঃ ৯৭-৯৮।

১০৫. (১) অলি মুহাম্মাদ ফল্তী (২) নাছিরুদ্দীন মঙ্গলোরী (৩) আওলাদ আলী আযীমাবাদী (৪) সৈয়দ নাছিরুদ্দীন দেহলভী (৫) সৈয়দ আবদুর রহীম সূরতী আফগানী।-'সারগুযাস্ত', পৃঃ ২৬, ১১৬, ১২১, ১৯৪-৯৬, ১৯৯।

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৬।

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২২।

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২২-২২৩।

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৪।

১১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৬।

১১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৪।

১১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪২।

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৭, ২৪৪, ২৪৩।

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৬, ২৫২।

১১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৮।

আক্রান্ত হয়ে ৬৪ বছর বয়সে বেলায়েত আলীর মৃত্যু হয় ও ঘাঁটির কবরস্থানেই তাঁকে দাফন করা হয়।[১১৬]

মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী (রহঃ) (১২০৫-১২৬৯/১৭৯০-১৮৫২ খৃঃ) : বর্তমান ভারতের বিহার প্রদেশের রাজধানী পাটনা শহরের আযীমাবাদ ছাদিকপুর মহল্লায় মাওলানা বেলায়েত আলী জন্মগ্রহণ করেন। খ্যাতনামা ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর বংশধর হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাদা আবদুল মুত্ত্বালিব মাওলানা বেলায়েত আলীর ৩৩ মত ঊর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন। সেজন্য তাঁর বংশকে হাশেমী বা যুবায়রী বংশ বলা হয়ে থাকে। বিহারের খ্যাতনামা অলি ও মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া মুনীরী (৬৬১-৭৮২/১২৬৫-১৩৮০) তাঁর ষোড়শতম দাদা ছিলেন।[১১৭]

পিতা মৌলবী ফাত্হ আলীর ছয় ছেলের মধ্যে তিনিই ছিলেন বড়। দ্বিতীয়জন মাওলানা এনায়েত আলী, তৃতীয়জন মৌলবী তালেব আলী ও ষষ্ঠজন মাওলানা ফারহাত হুসাইন জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ৪র্থ ও ৫ম যথাক্রমে মাহদী হুসাইন ও ইবরাহীম হুসাইন শিশু অবস্থায় মারা যান। পিতার বড় ছেলে হওয়ার কারণে তাঁকে সবাই 'বড় হযরত' بڑے حضرت বলে ডাকত।[১১৮]

মাওলানা বেলায়েত আলীর পারিবারিক জীবন ছিল প্রাচুর্যে ভরা। তাঁর নানা রফীউদ্দীন হুসায়েন খান মুর্শিদাবাদের নবাবের পক্ষ হ'তে বিহারের নাযেম সুবাদার ও মশহুর সর্দার ছিলেন।[১১৯] নানার আদরে লালিত বেলায়েত আলীর ছোটবেলায় নানার মতই দামী ও আড়ম্বরপূর্ণ পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে থাকতেন। লাক্ষ্ণৌয়ে পাঠাভ্যাসকালে তিনি স্বীয় উস্তাদ মৌলবী আশরাফসহ আমীরুল মুমিনীন সৈয়দ আহমাদ-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। এই বায়'আত তাঁর জীবনে আমূল পবিবর্তন এনে দেয়।[১২০] তিনি লেখাপড়া ত্যাগ করে মাত্র ২০ বছর বয়সে সৈয়দ আহমাদের সঙ্গে রায়বেরেলী চলে যান। তাঁকে আল্লামা শাহ ইসমাঈলের জামা'আতে ভর্তি করে দেওয়া হয়। শাহ ইসমাঈলের নিকটে তিনি কিছু লেখাপড়াও শিখেন। ইতিপূর্বে মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু ঘর ছেড়ে নিঃস্ব অবস্থায় জিহাদে বের হ'য়ে যেতে তাঁর একটুও বাঁধেনি। ইবাদত ও লেখাপড়ার সময়টুকু ছাড়া বাকী সমস্ত সময়টা তিনি সাথী মুজাহিদগণের খিদমতে কাটিয়ে দিতেন। জংগলে গিয়ে কাঠ কেটে আনতেন। নিজের হাতে রান্না করতেন। এমন কোন মামুলী কাজ ছিলনা যা তিনি করতেন না।[১২১]

মাওলানা বেলায়েত আলীর পিতা যখন জানতে পারলেন যে, তিনি রায়বেরেলী চলে গিয়েছেন, তখন বাড়ীর একজন কর্মচারীর মাধ্যমে তিনি ছেলের জন্য কিছু নগদ টাকা ও কাপড়-চোপড় পাঠিয়ে দিলেন। ঐ সময় সৈয়দ আহমদ মেহমানদের জন্য মুজাহিদগণের সাহায্যে একটি ঘর তৈরি করছিলেন। সৈয়দ আহমাদ নিজেও কাজ করছিলেন এবং বিভিন্নজনকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ঘরের কাদামাটি তৈরীর দলে ছিলেন মাওলানা বেলায়েত আলী। কর্মচারীটি যখন সেখানে পৌঁছল, তখন কাদামটি মেখে কালো তহবন্দ পরা মাওলানা ছাহেবকে সে চিনতে পারল না। মাওলানা তাঁর আব্বার পাঠান টাকা-পয়সা ও কাপড়-চোপড় তখনই গিয়ে আমীর সৈয়দ আহমাদের হাওয়ালা করেন। তিন চারদিন অপেক্ষা করেও যখন দেখা গেল যে, তিনি সেইসব উত্তম পোষাক পরলেন না; বরং একই ময়লা তহবন্দ পরে রইলেন তখন কর্মচারীটি হতবাক হয়ে দুঃখিত মনে পাটনা ফিরে গেল।[১২২]

রায়বেরেলীতে প্রশিক্ষণ নিয়ে মাওলানা বেলায়েত আলী দেশে ফিরলেন। কিন্তু তখন তিনি সম্পূর্ণ নতুন মানুষে পরিণত হয়েছেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি দা'ওয়াত ও তাবলীগে ব্যয় করতে থাকলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় তাঁর পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্য জিহাদ আন্দোলনে যোগ দেন। পাটনায় অবস্থানকালে তিনি প্রতি মঙ্গলবার বাদ মাগরিব নিজ বাড়ীর আঙ্গিনায় ওয়ায করতেন। সেখানে একপাশে পাঁচ-ছয়শো মহিলা ও অন্যপাশে পাঁচ-ছয় হাযার পরুষ জমা হ'তেন। তাঁর ওয়াযের এমন একটা প্রভাব ছিল যে, যেই শুন্‌ত সেই-ই মুগ্ধ হ'ত।[১২৩]

আযীমাবাদ অবস্থানকালে তিনি প্রতিদিন যোহর হ'তে আছর পর্যন্ত কুরআন ও হাদীছের দারস দিতেন। কুরআন মাজীদ ও 'বুলূগুল মারাম' হাদীছ গ্রন্থের শাব্দিক তরজমা সবাইকে বুঝিয়ে দিতেন। ফলে নিরক্ষর ব্যক্তিও ছালাতে নিজের পঠিত সূরা ও দো'আ সমূহের অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারত। তিনি ঘরে বসেই তাবলীগী দায়িত্ব শেষ করেননি বরং স্বীয় উস্তাদ শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর ন্যায় বিভিন্ন মেলা ও অনুষ্ঠানসমূহে গিয়ে তিনি লোকদেরকে দ্বীনের পথে দাওয়াত দিতেন। মাঠে গিয়ে রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে কৃষকদেরকে ওয়ায শুনাতেন। কোন স্থানের উদ্দেশ্যে বের হ'লে গ্রামে গ্রামে তাবলীগ করতে করতে সেখানে পৌঁছতে তাঁর কয়েকমাস সময় লেগে যেত।[১২৪]

মাওলানা বেলায়েত আলী তাঁর চারপাশে সর্বদা সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন দেখতে চাইতেন এবং যাবতীয় বিদ'আত দূরীকরণের চেষ্টায় রত থাকতেন। তাঁর মুরীদান ও আশপাশের সমস্ত লোক কিতাব ও সুন্নাতের পাবন্দ হয়ে গিয়েছিল। বিধবা বিবাহ যা সে সময়ে খুবই নিন্দনীয় ও লজ্জাস্কর কাজ বলে বিবেচিত হ'ত, তিনি তা নিজের পরিবার থেকেই শুরু করে দিয়েছিলেন। একজন স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা ভদ্র ঘরে খুবই নিন্দনীয় ছিল। তিনি এই রেওয়াজও ভেঙ্গে দেন। বিবাহে ধুম-ধাম করা একটি আবশ্যিক বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। তিনি এই নিয়ম বাতিল করে দেন। নিজের দুই ছেলে আবদুল্লাহ ও হেদায়াতুল্লাহ্‌র বিয়ে ছোট ভাই ফারহাত হুসাইনের দুই মেয়ের সঙ্গে দেন তাদের পুরানো তালি দেওয়া পোষাক পরিয়ে। বর-কণেকে একজোড়া করে নতুন কাপড়ও তিনি কিনে দেননি। জনৈক মুরীদ আবদুল গণীকে এক বিধবার সঙ্গে বিবাহ দেন মোহর হিসাবে স্রেফ কুরআন শিখানোর বিনিময়ে। অথচ সেই যুগে উচ্চ মোহরানা উচ্চ বংশের নমুনা হিসাবে গণ্য হ'ত। নিজের সমস্ত আয় তিনি বায়তুল মালে জমা করে সেখান থেকে প্রয়োজন মত নিতেন। বাকী সবই দ্বীনের পথে ব্যয় করে দিতেন।[১২৫]

[দ্রষ্টব্য : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' (পিএইচ.ডি থিসিস) শীর্ষক গ্রন্থ। পৃঃ ২৮৮-২৯২]

১১৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৩।
১১৭. মৌলবী আবদুর রহীম, 'তাযকেরায়ে ছাদেক্বাহ', পৃঃ ৮-৯।
১১৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।
১১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪।
১২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২-৯৩।
১২১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪।
১২২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪-৯৫।
১২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২।
১২৪. মেহের 'সারগুযাস্তে মুজাহেদীন' পৃঃ ২১৬; আলী নদভী, 'সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ (লাক্ষ্ণৌ : নামী প্রেস, মার্চ ১৯৩৯), পৃঃ ৪১৭।
১২৫. নদবী, 'সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ' পৃঃ ৪১৮; 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ', পৃঃ ১০১-১০২।

আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত ভাষণ

পাবনার অভিভাষণ

[১৯৪৭ সালের ৯ই ও ১০ই মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত পাবনা যেলা আহলেহাদীছ কন্‌ফারেন্সে তৎকালীন 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত অভিভাষণ]

(৩য় কিস্তি)

হিস্পানিয়ার বিখ্যাত উছূলী ইমাম ইবরাহীম বিন মূসা শাতেবী (মৃত ৭১০ হিঃ) লিখিয়াছেন, 'সৃষ্ট জীবের সকল প্রয়োজনকে মিটানই শরী'আতের উদ্দেশ্য'। শাতেবী সকল প্রয়াজনকে মোটামুটি ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,

مجموع الضروريات خمسة : حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل

'ধর্ম রক্ষা, প্রাণ রক্ষা, বংশ রক্ষা, ধন রক্ষা ও জ্ঞান রক্ষা এই পঞ্চবিধ প্রয়োজনকে পূরণ করাই শরী'আতের উদ্দেশ্য'। শরী'আতের যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা : ইবাদত, অভ্যাস ও ব্যবহার।

ইবাদতের নিয়মগুলিকে ধর্ম রক্ষার জন্য, অভ্যাসের মূলনীতিগুলিকে প্রাণ ও জ্ঞান রক্ষার জন্য এবং ব্যবহারিক নীতিগুলিকে বংশ ও ধন রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

ঈমান, কালেমার উচ্চারণ, ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও হজ্জ প্রভৃতি ইবাদতের মূলনীতির পর্যায়ভুক্ত। পানাহার, পরিধেয় ও বসবাসের ব্যাপারসমূহ অভ্যাসের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। যে সকল মানবীয় স্বার্থ পারস্পরিক সহযোগের সাহায্যে সংরক্ষিত অথবা বিধ্বস্ত হয়, সেগুলি ব্যবহারিক নীতির শ্রেণীভুক্ত। যথা : চুক্তি সম্পর্কিত ব্যাপার, কার্যবিধি ও দণ্ডবিধি *(আল-মুয়াফেকাত ২/৩-৪ পৃঃ)*। কিন্তু শুধু প্রয়োজন মিটানই শরী'আতের উদ্দেশ্য নয়; স্থান, কাল ও পাত্রভেদে আদেশের কঠোরতা হ্রাস করিয়া সহজসাধ্য ও সুবিধাজনক আদেশ প্রদান করাও শরী'আতের অন্যতম উদ্দেশ্য। যথা : ইবাদত শ্রেণীর মধ্যে প্রবাসী ও রোগীর জন্য ছালাতের নিয়ম ও সংখ্যার লঘুতা সাধন, ছিয়ামের জন্য সময়ের পরিবর্তন।

ধর্মের এতগুলি উদ্দেশ্যের মধ্যে ইউরোপীয় ভাবধারার মুক্বাল্লিদগণ ধর্মের কোন প্রয়োজনটি যে স্বীকার করিতে চাহেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কারণ ইসলামের আদর্শ তাওহীদ ও ইবাদত পর্যন্ত মানুষের ব্যক্তিগত ও নিজস্ব ব্যাপার নয়।

> ইসলামের সজীবতা ও পূর্ণতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন এই যে, আমাদের রাসূল খাতামুল মুরসালীন। অতঃপর কোন পয়গম্বরের আগমনের সম্ভাবনা নাই, প্রলয়কাল পর্যন্ত আমাদের রাসূল (ছাঃ)-এর রিসালাতের যুগ সচল থাকিবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়কাল পর্যন্ত মানব সমাজের সম্মুখে যত প্রকার সমস্যার উদ্ভব হইবে, এই উম্মতের শ্রেষ্ঠাংশকে রাসূল (ছাঃ) প্রতিনিধিরূপে তাহার সমাধান করিতে হইবে। কিন্তু এই সকল সমাধান কখনও অভ্রান্ত অহীর স্থান অধিকার করিবে না এবং মুজতাহিদবর্গের সিদ্ধান্তগুলি কিতাব ও সুন্নাতের মত অকাট্য ও অপরিবর্তনীয় বিবেচিত হইবে না।

সাধারণতঃ যাঁহারা দ্বীন ও দুনিয়া বলিয়া দুইটা স্বতন্ত্র বস্তুর ধারণা করিয়া লইয়াছেন, আমার মনে হয় তাঁহারা কেবল আখেরাত ও পরবর্তী জীবনকে দ্বীন বা ধর্ম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্বীন, শরী'আত ও ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার অর্থ ও প্রয়োগের প্রতি দারুন অবহেলা প্রকাশ করিয়াছেন।

حفظت شيا وغابت عنك اشياء!

দ্বীন, শরী'আত, ইসলাম বা ধর্মের যে ব্যাখ্যা এযাবত আলোচিত হইয়াছে, কুরআনের দাবী তাহাই। দশম হিজরীর ৯ই যিলহজ্জ তারিখের বৈকালে আরাফাত প্রান্তরে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বক্তৃতা দান করিতেছিলেন এবং ঘন ঘন আকাশের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিতেছিলেন ঠিক সেই সময় আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

'অদ্যকার দিবসে আমি (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন বা ধর্মকে পূর্ণতা দান করিলাম এবং তোমাদের জন্য আমার নে'মতকে নিঃশেষিত করিয়া ফেলিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামের দ্বীন বা ব্যবস্থায় স্বীয় সন্তুষ্টি বা সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*।

কুরআনের প্রাচীনতম ও বিশ্বস্ত ব্যাখ্যাকার ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (মৃত ৩১০ হিঃ) উল্লিখিত আয়াতের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'হে বিশ্বাসী জনবৃন্দ! আজিকার দিবসে তোমাদের জন্য অবশ্য প্রতিপালনীয় আমার আদেশ বাণী, আমার দণ্ডবিধি তোমাদের প্রতি আমার আদেশ ও নিষেধ, আমার হালাল ও হারাম এবং আমার প্রত্যাদেশ, যাহা আমি আমার গ্রন্থে অবতীর্ণ করিয়াছি ও আমার ব্যাখ্যা, যাহা আমার রাসূলের বাচনিক আমি অহীর সাহায্যে প্রত্যাদেশ করিয়াছি এবং দ্বীন সম্পর্কে তোমাদের যাহা প্রয়োজনীয় তৎসমুদয়ের দলীল তোমাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, সমস্তই তোমাদের জন্য আজ শেষ করিতেছি। অতঃপর এই সকল বিষয়ে আর পরিবর্তন সাধিত হইবে না' *(তাফসীর ইবনে জারীর ৬/৫১ পৃঃ)*।

আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠতম মুফাসসির আল্লামা সৈয়দ রশীদ রিযা (রহঃ) বলেন, 'দ্বীনের পূর্ণতার তাৎপর্য এই যে, মতবাদ ও ইবাদত সম্পর্কে আদেশ ও বিধান এবং এই অর্থে যত বিষয় থাকিতে পারে তৎসমুদয় বিস্তৃতভাবে এবং ব্যবহারিক আদেশ নিষেধগুলি সংক্ষিপ্তভাবে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে' *(তাফসীর আল-মানার ৬/১৬৬ পৃঃ)*।

মোটকথা ইবাদত, প্রাণরক্ষা, বংশরক্ষা, ধনরক্ষা ও জ্ঞান রক্ষার সমুদয় বিধান শরী'আতের মাধ্যমে অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাতের সাহায্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, হয় প্রকাশ্যে নয় অপ্রকাশ্যে, হয় সংক্ষেপে নয় সবিস্তারে। সে সকল আদেশ ও নিষেধ কিতাব ও সুন্নাতের সাহায্যে প্রকাশিত ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে প্রলয়কাল পর্যন্ত সেগুলির সংশোধন বা পরিবর্তনের আবশ্যক হইবে না, কিন্তু যে সকল আদেশ ইঙ্গিতে ও সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে সেইগুলিকে প্রকাশিত ও বিস্তৃত করার ভার এই উম্মতের যোগ্যতার ব্যক্তিবর্গের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। অপ্রকাশ্যকে প্রকাশ্য ও সংক্ষিপ্তকে বিস্তৃত করার এই সাধনাকে ইসলামী পরিভাষায় 'ইজতিহাদ' বলে।

ইসলামের সজীবতা ও পূর্ণতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন এই যে, আমাদের রাসূল খাতামুল মুরসালীন। অতঃপর কোন পয়গম্বরের আগমনের সম্ভাবনা নাই, প্রলয়কাল পর্যন্ত আমাদের রাসূল (ছাঃ)-এর রিসালাতের যুগ সচল থাকিবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়কাল পর্যন্ত মানব সমাজের সম্মুখে যত প্রকার সমস্যার উদ্ভব হইবে, এই উম্মতের শ্রেষ্ঠাংশকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিনিধিরূপে তাহার সমাধান করিতে হইবে। কিন্তু এই সকল সমাধান কখনও অভ্রান্ত অহীর স্থান অধিকার করিবে না এবং মুজতাহিদবর্গের সিদ্ধান্তগুলি কিতাব ও সুন্নাতের মত অকাট্য ও অপরিবর্তনীয় বিবেচিত হইবে না।

কিন্তু বাগদাদের পতনের পর (৬৫৬ হিঃ, ১৪ই সফর, বুধবার) যখন মুসলিমগণের জাতীয় শক্তি শতধাবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, তখন ফকীহগণ নবুঅতের মত ইজতিহাদের দ্বারকেও চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ডক্টর মুহাম্মাদ ইকবাল বলিতেছেন,

For fear of further disintegration, which is only natural in such a period of political decay. the conservative thinkers of Islam focussed all their efforts on the point pf preserving a uniform social life for the people by a Jealous exclusion of all innovations in law of shariat as expounded by the early doctors of Islam.

'তাতারী অভিযানের ফলে জাতীয় অটুটতার যে অঙ্গহানি ঘটিয়াছিল, পাছে তাহা অধিকতর বর্ধিত হয়, এই আশঙ্কায় সনাতন মতের মনীষীবৃন্দ তাঁহাদের সমুদয় প্রচেষ্টা সমগ্র জাতিকে এক ও অভিন্ন জীবনযাত্রা প্রণালীতে নিয়োজিত করিবার কার্যে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন। প্রাথমিক যুগের আলেমগণ শরী'আতের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহার বহির্ভূত সকল নবাবিষ্কৃত মত ও কার্যকে তাঁহারা সমাজ দেহ হইতে অপসারিত করার কার্যে পরমোৎসাহে লাগিয়া গেলেন' *(Reconstruction of Religious thought, P.211.)* ফলে তাঁহারা ঘোষণা করিলেন,

اختتم الاجتهاد المطلق علي الائمة الاربعة حتي اوجبوا تقليد واحد من هولاء علي الامة.

'পূর্ণ ইজতিহাদ ইমাম চতুষ্টয় পর্যন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে, এমনকি তাঁহারা ফাতাওয়া দিলেন যে, ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে একজনের তাক্বলীদ করা উম্মতের উপর ওয়াজিব' *(ফাওয়াতেহুর রহমুত, পৃঃ ৬২৪)*।

এই প্রসঙ্গে অষ্টম শতকের অন্যতম সংস্কারক ও মুহাদ্দিছ হাফিয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলিতেছেন, 'অন্ধ ভক্তের দল আল্লাহ্র বিধান ও শরী'আতের প্রতিকূল আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্পষ্ট আদেশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ঘোষণা করিয়াছে যে, পৃথিবীর উপর আল্লাহ্র দ্বীনকে প্রমাণিত করার কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে এবং অতীত যুগের পর পৃথিবীতে কোন আলেম আর অবশিষ্ট নাই'। একদল বলিতেছেন যে, 'ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, যুফার বিন হুযায়ল, মুহাম্মাদ বিন হাসান ও হাসান বিন যিয়াদের পর আর কোন আলেমের পক্ষে ইজতিহাদ করা বৈধ হইবে না'। বকর বিন উলা-কুশায়রী মালেকী বলেন, 'দুইশত হিজরীর পর কাহারও ইজতিহাদের অধিকার নাই'। আবার কেহ বলিতেছেন, 'আওযাঈ, সুফইয়ান সাওরী, ওয়াক্বী বিন জার্‌রাহ ও আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের পর কাহারও পক্ষে ইজতিহাদ করা দুরস্ত নয়'। আর একদল বলিতেছেন যে, 'ইমাম শাফেয়ীর পর ইজতিহাদ একেবারেই অসিদ্ধ'।

ইজতিহাদের দ্বার কোন সময় রুদ্ধ হইয়াছে সে সম্পর্কে নানা প্রকার অপ্রমাণিত উক্তির সাহায্যে মুক্বাল্লিদের দল মতভেদ করিয়াছে। তাহাদের বিবেচনায় আল্লাহ্র শরী'আতের প্রতিষ্ঠাকারী পৃথিবীর বুকের উপর আর কেউই নাই। স্বীয় বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া কথা বলিবার কাহারও অধিকার নাই এবং আল্লাহ্র গ্রন্থ ও তদীয় রাসূলের সুন্নাত হইতে আদেশ-নিষেধ আহরণ করা কাহারও জন্য বৈধ নয় এবং অনুসরণীয় ইমামগণের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত কিতাব ও সুন্নাত অনুসারে বিচার ব্যবস্থা করা ও ফাতাওয়া দেওয়া কাহারও পক্ষে সিদ্ধ নয়। আল্লাহ্র গ্রন্থ ও রাসূলের সুন্নাতের নির্দেশ পালন করিবার জন্য যদি তাঁহাদের অনুমতি পাওয়া যায় তবেই তাহা প্রতিপালনীয় বলিয়া গণ্য হইবে, নতুবা তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া দিতে হইবে।

এই উক্তিগুলি যেরূপ অসত্য, অনিষ্টকর এবং পরস্পর বিরোধী তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ এবং তাঁহার উক্তির খণ্ডন এই সকল উক্তির মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এই সকল কথা আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের উপর বিতৃষ্ণা আনিয়া দেয়। আল্লাহ তাঁহার জ্যোতিকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করিবেন এবং তাঁহার রাসূলের উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন করিবেন। পৃথিবী কখনও এরূপভাবে শূন্য হইবে না, যাহাতে সত্যের প্রতিষ্ঠাকারী কেউই না থাকে। রাসূল (ছাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে এরূপ একদল সর্বদা অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবেন, যাঁহারা যে সত্য দ্বীন সহকারে রাসূল (ছাঃ) প্রেরিত হইয়াছিলেন সেই সনাতন সত্যের উপর তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত থাবিবেন এবং প্রত্যেক শতাব্দীর পুরোভাগে আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে যে সকল আবরণ ও আবর্জনা স্তূপীকৃত হইবে সেইগুলি অপসারিত করিবার জন্য সংস্কারক প্রেরিত হইতে থাকিবেন।

যাহারা বলে যে, অমুক অমুকের পর আর কাহারও ইজতিহাদ গ্রাহ্য হইবে না, তাহাদের উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাদিগকে ইহা বলা যথেষ্ট হইতে পারে যে, যখন কাহারও সিদ্ধান্ত এখন গ্রহণীয় নয়, তখন তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে, শুধু অমুক অমুকের অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা কিরূপে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে? আল্লাহ্র গ্রন্থ ও রাসূলের সুন্নাতের অনুকূল মানুষের উপর ইজতিহাদের অনুসরণ করাকে তোমরা কি প্রকারে হারাম করিয়া দিলে? আর তোমাদের জন্য তাক্বলীদের অনুসরণ কার্যকে বৈধ বলিয়া কিরূপে স্থির করিলে? আর সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য তাঁহাদের তাক্বলীদকে ওয়াজিব এবং তাঁহাদের ছাড়া অন্য ব্যক্তির অনুসরণ কার্যকে হারাম বলিয়া কিভাবে নির্ধারিত করিলে? এক দলের পরিবর্তে আর এক দলের তাক্বলীদকে অগ্রণী করিবার তোমাদের নিকট কি যুক্তি রহিয়াছে? যে

সিদ্ধান্তের পক্ষে কিতাব, সুন্নাত, ইজমা ও ক্বিয়াসের দলীল, এমন কি কোন ছাহাবীর উক্তিও বিদ্যমান নাই তাহা গ্রহণ করিবার এবং কিতাব ও সুন্নাতের সাহায্যে প্রমাণিত ও ছাহাবীগণ কর্তৃক সমর্থিত সিদ্ধান্তকে বর্জন করিবার হেতুবাদ কি? *(ইলামুল মুয়াক্কেঈন, ২/৩৫৫ পৃঃ)*।

আমি বলিতে চাই যে, ইমামগণের যাবতীয় সিদ্ধান্তই যে বর্জনীয় হইবে, তাহা কোন কাজের কথা নয়, তাঁহাদের অনেকগুলি সিদ্ধান্ত তাঁহাদের যুগের পক্ষে যে অবশ্য ও গ্রহণযোগ্য ছিল তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই, কিন্তু হাযার বৎসরের অধিককাল অতিবাহিত হওয়ার পরও যে মানবীয় প্রয়োজন ও সমস্যা অপরিবর্তনীয় থাকিবে, এরূপ ধারণা করাও যুক্তিসংগত নয়। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাতের অপরিবর্তনীয় মূলনীতিকে ভিত্তি করিয়া মানুষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সকল যুগে ইজতিহাদ ও গবেষণার দ্বার মুক্ত রাখিতে হইবে, নতুবা ইসলামের চিরঞ্জীবতার দাবী যেরূপ মিথ্যা হইয়া যাইবে, মানুষ প্রয়োজনের দায়ে তেমনি ইসলামের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অনৈসলামিক ভাবধারার শরণাগত হইতে বাধ্য হইবে।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর অন্যতম প্রধান মূলনীতি হইতেছে ইজতিহাদের দাবীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলামকে চিরন্তন, সর্বযুগীয় মানব জাতির সর্বাবিধ প্রয়োজন পূরণকারী বলিয়া সাব্যস্ত করা। বর্তমান যুগে ইসলাম জগতের সর্বত্র তাক্বলীদের পতন ও ইজতিহাদের উত্থান সূচিত হইয়াছে; কিন্তু শুধু আবু হানীফা ও মালেকের তাক্বলীদ বর্জিত হয় নাই; আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্যের বন্ধন হইতেও মুক্তিলাভ করার চেষ্টা চলিতেছে এবং ইজতিহাদকে কিতাব ও সুন্নাতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার অন্ধ অনুসরণ হিন্দুয়ানী উচ্ছিষ্ট ভোজন এবং ব্যক্তিগত খোশ খেয়ালের অনুগমন কার্যকে প্রগতিবাদ, ইজতিহাদ ও গবেষণার পরাকাষ্ঠারূপে গ্রহণ করা হইতেছে। সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-পদ্ধতি, রুশের নাস্তিকতাবাদী কমিউনিজম, গান্ধীর হিন্দু সমাজতন্ত্রবাদ সমস্তই আজকে মুসলিমগণের পক্ষে লোভনীয়, গ্রহণীয় ও বরণীয় হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু মুহাম্মাদীয় নীতির ভিত্তির উপর ইসলামী সমাজতন্ত্র ও শাসন পদ্ধতিকে গবেষণা করিবার ও তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার প্রয়োজন মুসলিমগণ অনুভব করিতেছেন না। কামাল আতা তুর্কী মুসলিমদের সংস্কার করিতে গিয়া স্বয়ং ইসলামের এরূপ সংস্কার করিয়া বসিয়াছেন যে, তাহাকে কামালী ইসলাম বা তুরানীজম বলা যাইতে পারে বটে; কিন্তু মুহাম্মাদী ইসলামের আখ্যা তাহাকে কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না। মুহাম্মাদ ইকবাল তুর্কী সংস্কার আন্দোলনের একান্ত পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও পরিশেষে উহার অনাচার ও ইসলাম বিদ্রোহের নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' স্বৈরাচার ও অনাচার বনাম প্রগতিবাদ ও শর্তবিহীন ইজতিহাদকে কোন দিন বরদাশত করে নাই, করিতে পারে না। ইজতিহাদের জন্য কয়েকটি শর্ত অবশ্য পালনীয়।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন,

وَمَعْنَى الِاجْتِهَادِ من الْحَاكِمِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ فِيمَا يريد الْقَضَاءُ فيه كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا أَمْرٍ مُجْتَمَعٍ عليه فَأَمَّا وَشَيْءٌ من ذلك مَوْجُودٌ فَلَا.

'ইজতিহাদের তাৎপর্য এই যে, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ভিতর যে সকল বিষয়ের নির্দেশ নাই মুসলিমগণের জাতীয় শাসনকর্তা সেই সকল বিষয়ের ইজতিহাদ করিবেন। যে সকল বিষয়ের নির্দেশ কুরআন, হাদীছ ও ইজমার ভিতর বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সকল বিষয়ে ইজতিহাদ অগ্রাহ্য' *(কিতাবুল উম্ম ৬/২০৪ পৃঃ)*।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন,

الخبر المرسل والضعيف عن رسول الله صلي الله عليه و سلم اولي من القياس ولا يحل القياس مع وجوده.

'যে হাদীছে রাবী ছাহাবীর নাম উল্লেখ না করিয়াই বর্ণিত হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এরূপ হাদীছ, যাহা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় নাই, ব্যক্তিগত অভিমত অপেক্ষা উত্তম এবং এইরূপ হাদীছের বিদ্যমানতায় ক্বিয়াস অসিদ্ধ' *(আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম ৭/৫৪ পৃঃ)*।

আহলেহাদীছগণ ব্যাপকভাবে মুরসাল ও যঈফ হাদীছকে গ্রাহ্য করেন না; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহারা সকল দলের মুসলিমের সহিত একমত যে, কুরআন ও হাদীছের নির্দেশ বর্তমান থাকা অবস্থায় ইজতিহাদ অসিদ্ধ ও হারাম।

দ্বিতীয় শর্ত : ইজতিহাদের তাৎপর্য কাহারো কাহারো বিবেচনায় ব্যক্তিগত গবেষণা ও সিদ্ধান্ত নয়। ইমাম সুফিয়ান ইবন ওয়ায়না (রহঃ) বলেন, اجتهاد الراي هو مشاورة السلم لان يقول براية 'ইজতিহাদের তাৎপর্য হইতেছে বিদ্বানগণের পরামর্শ; ব্যক্তিগত অভিমতের নাম ইজতিহাদ নয়' *(আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম ৬/৩৬ পৃঃ)*।

তৃতীয় শর্ত : কুরআন ও হাদীছের ভিতর হইতে ঈপ্সিত মাসআলাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার কার্যকে একদল আহলেহাদীছ ইজতিহাদ বলিয়াছেন। বিখ্যাত মুজতাহিদ ইমাম ইবনু হজম (রহঃ) বলেন,

انما الاجتهاد اشهاد النفس واستفراغ الوسع في طلب حكم النار في القران والسنة فان طلب القران والتقرأ أياته وطلب في السنن وتقرا الحديث في طلب ما نزل به فقد اجتهد.

'আসন্ন সমস্যার মীমাংসা কুরআন ও সুন্নাত হইতে প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবার কার্যকে ইজতিহাদ বলে। যে ব্যক্তি কুরআনের ভিতর উক্ত সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করিয়াছে এবং তৎসম্পর্কিত আয়াত পাঠ করিয়াছে অথবা হাদীছের ভিতর উক্ত প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিয়াছে এবং তাহা পাঠ করিয়াছে সেই ব্যক্তি ইজতিহাদ করিয়াছে' *(আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম ৭/১৪৪ পৃঃ)*।

চতুর্থ শর্ত : ব্যক্তিগত অভিমত ও সিদ্ধান্তকে সকল আহলেহাদীছ বাতিল করেন নাই; কিন্তু নিছক সিদ্ধান্ত বা ব্যক্তিগত অভিমত শরী'আতসম্মত ক্বিয়াসের পর্যায়ভুক্ত নয়। মুজাদ্দিদে ইসলাম আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) বলেন, والقياس شرطه ان يكون الاصل فيمن قبيل المنصوصات او الاجماعيات. 'শর্ত এই যে কিতাব ও সুন্নাত অথবা ইজমাকে ভিত্তি করিয়া ক্বিয়াস করিতে হইবে অর্থাৎ যে ক্বিয়াস কিতাব, সুন্নাত ও ইজমার ভিত্তির উপর সঙ্কলিত হয় নাই, তাহা ক্বিয়াস পদবাচ্য নহে'। *(ক্রমশঃ)*

[দ্রষ্টব্য : আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী প্রণীত 'আহলেহাদীছ পরিচিতি' গ্রন্থ, পৃঃ ২৪-৩৪]

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ
তথাকথিত শরী'আত বিল

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

[পাকিস্তানের তৎকালীন সেনাপতি জেনারেল জিয়াউল হক পাকিস্তানে 'শরী'আত বিল' নামে একটা বিল পাশ করেছিল। যেখানে কুরআন ও হাদীছের পাশাপাশি চার মাযহাবের কোন এক মাযহাব মানা এবং তদনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করার কথা উল্লেখ ছিল। যাতে তৎকালীন সময়ের প্রায় সকল মাযহাবের লোক স্বাক্ষর করেছিল। কিন্তু ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ) ও তার সংগঠন 'জময়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান' এর বিরোধিতা করেছিল। সেই উপলক্ষ্যেই তিনি ফায়ছালাবাদে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। যা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে 'তাওহীদের ডাক'-এর পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করা হল। অনুবাদক]

সম্মানিত উপস্থিতি!

আজ আমি আমার তৃতীয় রাউণ্ডের শেষ জালসা থেকে বক্তব্য দিতে গিয়ে অন্তরে খুব প্রশান্তি অনুভব করছি এই ভেবে যে, আজকে শাহ ইসমাঈল শহীদের মানসপুত্ররা জেগে উঠেছে। দাঊদ গযনবীর কওম গা ঝাঁড়া দিয়ে উঠেছে। ইসমাঈল সালাফীর লাগানো চারা আজ ফুলে ফলে ভরা এক বৃক্ষে পরিণত হয়েছে এবং আজকে শায়খুল ইসলাম ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)-এর কবরে আল্লাহ নূর বর্ষণ করুন। আমীন! তিনি যার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন তার ফল আজকে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আজ এই সফরের শেষ প্রান্তে এসে শারীরিকভাবে প্রচণ্ড দুর্বলতা অনুভব করার পরেও নিজেকে আন্তরিক শক্তিতে ও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান অনুভব করছি।

আল্লাহ্র রহমতে আজ পাকিস্তানে কুরআনের হুকুম চালু হওয়ার সময় চলে এসেছে। রাসূল (ছাঃ)-এর ফরমানকে আইনে পরিণত করার সময় চলে এসেছে। কেননা আজ হক্বের কাফেলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জেগে উঠেছে। আর এই কাফেলা যখন তার নওজোয়ান ও বৃদ্ধদের নিয়ে জেগে ওঠে তখন দুনিয়ার কোনও শক্তি তাদেরকে কাংখিত সাফল্য থেকে দূরে রাখতে পারে না। আজকে জময়তের অধীনে ৬ মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত '১৮তম আযীমুশ শান ইসলামী সম্মেলন' থেকে বক্তব্য দিতে গিয়ে অনুভব করতে পারছি যে, এই যুগ হক্বপন্থীদের যুগ, এ যুগ কুরআন ও সুন্নাহর যুগ। আজকে দুনিয়ার কোনও শক্তি পাকিস্তানের আকাশে কুরআন ও সুন্নাতের পতাকা উড্ডীন করানো থেকে বাধা দিতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ।

ভ্রাতৃবৃন্দ! আজ আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলতে চাই। আপনাদের জামা'আতের একজন নগণ্য কর্মী ও চৌকিদার হওয়ার কারণে আমার বক্তব্যের সুযোগ সর্বদা শেষে আসে। ফলত সময় সংকীর্ণতার কারণে অনেক কথা যা অন্তরে কল্পনা করে আসি আর বলব মনে করি তা বলতে পারি না। আজ এই আযীমুশ শান সম্মেলন থেকে দু'তিনটি মৌলিক কথা বলতে চাই।

১ম কথা : শরী'আত বিলের ব্যাপারে।

২য় কথা : পাকিস্তানের শাসকদের নিয়ে।

৩য় কথা : ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার উপর।

সম্মানিত উপস্থিতি! আজ এই কথা ছড়ানো হচ্ছে যে, 'জময়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান' এবং বিশেষ করে ইহসান ইলাহী যহীর শরী'আত বিলের বিরোধিতা করছে। আজ আমি এই কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, 'আমরা এমন লোক নই যে, কারো ধমকিতে ভীত হয়ে যাব এবং মিথ্যা প্রপাগাণ্ডায় প্রভাবিত হব'। আজ থেকে তিন মাস পূর্বে আমি যখন আমেরিকার সফর থেকে দেশে ফিরি, তখন লাহোর পৌঁছতেই আমাকে বলা হল, এক শরী'আত বিল পেশ হয়েছে, যেটি সকল মাকতাবায়ে ফিকর বা School of thought-এর লোকেরা মেনে নিয়েছে আপনিও মেনে নিন। আমি বললাম, 'আমি ওয়াহ্হাবীদের ছেলে, না পড়ে মানতে পারি না। পড়ার পর সেখানে দেখি জীম ও দাল বৃদ্ধি করা হয়েছে'।[১২৬]

আমি বললাম, 'আমি সেই মানুষ, যার আক্বীদা হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), যিনি ফক্বীহদের মাঝে অনেক উঁচু মর্যাদার অধিকারী। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর বিরুদ্ধে যারা বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা ও গালি-গালাজ করে সে আহলেহাদীছ হওয়া তো দূরের কথা একজন মুসলিম কি-না তাই সন্দেহ। কিন্তু শুনে রাখ! এর সাথে সাথে আমার আক্বীদা হচ্ছে দুনিয়ার বুকে আল্লাহ যদি কাউকে মা'ছূম বানিয়ে থাকেন তাহলে আমিনার লালকে[১২৭] বানিয়েছেন, অন্য কাউকে নয়। এই জন্য কোনও গায়র মা'ছূম মানুষের কথাকে শরী'আত মানতে পারি না। আমাকে হত্যা করে দাও আমার উপর যুলুম কর! আমার অপরাধ এটাই যে, আমি সত্য বলেছি। তোমাদের যা মনে চায় বল; কিন্তু আমরা জীবিত থাকতে কুরআন ব্যতীত এবং দুনিয়ার রহমত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ফরমান ব্যতীত অন্য কারো কথাকে শরী'আত হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না'।

তিনি দারাজ গলায় বলেন, 'শুধু আমি নই আমাদের পূর্বসূরিরাও যখন বাস্তবেই হক্ব কথা বলতেন তখন তাদেরকেও ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছিল। আর তারা এমন সময় এই দাওয়াত প্রচার করেছেন যখন ভারত উপমহাদেশে ওয়াহ্হাবী হাতে গণা যেত। তারা তাদের ডানে-বামে অনুসারীদের সংখ্যা কত তা দেখেননি। আর আজ আমি তো বলব খায়বার থেকে করাচী পর্যন্ত আহলেহাদীছ এই দেশে তার শক্তি সামর্থ্যের জানান দিয়েছে। আজ দুনিয়ার কোনও শক্তি এই দেশে আহলেহাদীছদের শক্তি-সামর্থ্যকে অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখাতে পারবে না। ঐদিন চলে গেছে যখন আহলেহাদীছদের হিতাকাংখী সেজে নামধারী শাসকরা আহলেহাদীছদেরকে খোটা দিত। আজ তোমরা ঐ আহলেহাদীছদের পাল্লায় পড়েছ, যারা আল্লাহ্র রহমতে তোমাদেরকে বছরের পর বছর ধরে পড়াতে পারবে, দারস দিতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

এই চেরাগ যখন জ্বলবে তখন আলো হবে। আর তোমরা ঐ সম্বলহীন চেরাগের দিকে দেখ না যে সন্ধ্যা থেকেই নিবু নিবু। শুনে রাখ! যে কেউ আহলেহাদীছদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবী করতে পারে না। চায় সে কারো কাঁধের উপর সোয়ার হয়ে আসুক। আহলেহাদীছ সেই, যে না অন্যের কাছে সাহায্য নেয়, না অন্যের কাছে মাথা ঝুঁকায়। সে ঐ কথা বলে, যা রবের কুরআনে আছে, মুহাম্মাদের ফরমানে আছে। তারা বলে তোমাদের অমুক অমুক তো মেনে নিয়েছে। আমি বলি, যে মেনে নিয়েছে সে মরে গেছে, সে নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে।

তারপর আমাদের হুংকার ধ্বনিত হল। আমরা বললাম, শুনে রাখ আমরা এই দেশকে কুরআন ও সুন্নাতের সাথে জুড়ে রাখার কসম খেয়েছি । ও! জোরে বল! আমরা এই দেশকে কুরআন ও সুন্নাতের সাথে জুড়ে রাখার কসম খেয়েছি। হাত উঁচু করে বল! আমরা এই দেশকে কুরআন ও সুন্নাতের সাথে জুড়ে রাখার কসম খেয়েছি। দুনিয়ার কোনও শক্তি আমাদের গায়রে শরী'আতকে শরী'আত মানাতে পারবে? জনগণ বলল, না।

'দৈনিক জং' ও 'নাওয়ায়ে ওয়াক্ত'-এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হল 'ইহসান ইলাহী যহীর কি কিয়া আযিয়াত' তথা ইহসান ইলাহী যহীরের কি সমস্যা? সেখানে একজন মাওলানা লিখেছে, এই শরী'আত বিল

---

১২৬. আরবী বর্ণের নাম্বারিক ক্রমধারা অনুযায়ী আলিফ ও বা-এর পর জীম আসে। উল্লেখ্য, শরী'আত বিলে আলিফ ও বা নম্বারে কুরআন ও হাদীছ লেখার পর জীম ও দাল নামে দু'টি ধারা আরো বৃদ্ধি করতঃ শরী'আতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। -*অনুবাদক।*

১২৭. উর্দূতে ও চাঁপাই নবাবগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় ছোট ছেলেদেরকে আদর করে লাল বলা হয়। -*অনুবাদক।*

ইংরেজের আইনের চাইতে তো ভাল। আমি বলেছি, না। আলী (রাঃ) খারেজীদের ব্যাপারে বলেছিলেন, কথা ঠিক কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ।

ইংরেজদের কানূনের চেয়ে ভাল নয়। আমাকে 'নাওয়ায়ে ওক্ত'-এর সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল, কেন? আমার জবাব প্রকাশিত হল, আমি বললাম, ইংরেজদের আইন আমরা কুফর মনে করে মেনেছিলাম, মুহাম্মাদের আইন মনে করে নয়। কিন্তু আজ আমরা গায়রে শরী'আতকে শরী'আত মেনেছি'।

তারপর এই ফকীরের কথা সফল হল। বড় বড় জামা'আত পঙ্গপালের মত লাফাতে লাগল আর বলতে লাগল নৌকা ডুবে গেল। ইহসান ইলাহী সব উলটপালট করে দিল। তারপর আমরা জালসা করলাম। পাকিস্তানের মাটিতে দুই একটা জামা'আত ছাড়া এত বড় জালসা কারো হয়নি। ইনশাআল্লাহ জালসা আরো হবে। ও বল! জালসা আরো হবে। জোরে বল! জালসা আরো হবে। ইনশাআল্লাহ আহলেহাদীছদের শক্তির জশন উদযাপন করা হবে। যাহোক ওলামাদের বোর্ড আবার বসল। কথা আবার এদিক ওদিক ঘুরানো হল। আমাদের থেকে তাদের একটাই ভয় আর সেই জন্যই তাদের রাগ। তাহল তারা আমাদেরকে এটা ওটা বলে ফুসলাতে পারবে না। আমাদের ব্রেনকে কেউ ওয়াশ করতে পারবে না। আর ছাহেবদেরকে তো খেলনা দিয়ে ফুসলানো হয়েছে। আশা-আকাঙ্খার বেড়াজালে ফাসানো হয়েছে। আমি বলেছি, 'কারো সাহস থাকলে আসুক, আমাকে শিকার করুক'। সব অশিক্ষিত লোক বসেছে, না উছূলে হাদীছ জানে, আর না উছূলে ফিকহ। আমার কথায় রাগ কর না। না উছূলে ইসলাম জানে।

আহলেহাদীছ তুমিও শুন! আমার সাথী যারা বক্তব্য শুনতে এসেছে তারাও শুন! তোমাদেরকে মহান আল্লাহ্‌র কসম! কুরআন ও সুন্নাতের অর্থ তোমরা জান? না জান না? ও! বল! তোমরা কি জান? কুরআন কাকে বলে? সুন্নাত কাকে বলে? জনগণ বলল, জি জানি। অথচ বড় বড় আলেম-ওলামা কুরআন ও সুন্নাতের অর্থ জানে না। কেননা ইনারা আমাদের হুংকারে, আমাদের দাবীতে বিলে পরিবর্তন এনে লিখেছে যে, শরী'আত কুরআন ও সুন্নাতের নাম। আর নিচে লিখেছে তাওযীহ তথা ব্যাখ্যা। বল! কুরআন ও সুন্নাতের অর্থ জানার জন্য ব্যাখ্যার দরকার আছে? মুসলিমের ঘরে জন্ম নেয়া একটা ছোট ছেলেও বলতে পারবে কুরআন কাকে বলে এবং সুন্নাত কাকে বলে? কিন্তু এরা ধোঁকাদানকারী শ্লোগান নিয়ে এসেছে। আর তারা জানে এই জাতি শ্লোগানে খুব প্রভাবিত হয় এবং খুব দ্রুত যোগ দেয়। জীম ও দালের বদলে তাওযীহ পয়েন্টের অধীনে ১, ২, ৩ ও ৪ দিয়ে গাইরে মা'ছূমের কথাকে শরী'আত বানানোর ফন্দি এঁটেছে। যা প্রথম বিলেও ছিল। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ব্যাখ্যায় লিখেছে যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত জানা যরূরী। ঠিক আছে। তারপরে লিখেছে আহলে বায়তে ইযামের সুন্নাত। আহলে বায়তে ইযাম কী? এটা শুধু মাত্র শী'আদেরকে খুশি করার জন্য লেখা হয়েছে। তারপর লিখেছে ইজমায়ে উম্মাত। তোমরা কি জান ইজমায়ে উম্মাত কাকে বলে? ইজমায়ে উম্মাত হচ্ছে, কৃওমী এসেম্বলির নাম। এসেম্বলির সদস্যরা যদি কোনও বিষয়ে একমত হয় তাহলে তা শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

লোগো! শুনো! এইগুলো হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাতের মাথায় তথা এগুলোই উপরে এবং কুরআন ও সুন্নাহ নিচে। আচ্ছা! বলত আবুবকর কী কুরআন বুঝেছিল না বুঝেনি? ফারূক কুরআন বুঝেছিল না বুঝেনি? যুন নূরাইন কুরআন বুঝেছিল না বুঝেনি? আলী মুরতযা কুরআন বুঝেছিল না বুঝেনি? তখন কোন ফক্বীহ ছিল যে, কুরআন ও হাদীছ বুঝার জন্য যার রায়ের দরকার পড়েছিল?

আর শুনো আমার কথা! তোমরা এই গাদ্দার জিয়াউল হক্বের কাছ থেকে ইসলামের আইন জারী করার দাবী কর? যে, রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বে ইনছাফী করেছে। শুনো, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই দুনিয়াতে এসেছিলেন তাঁর সুন্নাতকে জারী করার জন্য, আর সে এসেছে তাঁর সুন্নাতকে নিয়ে মজাক করার জন্য। সে কি করেছে? এই দেশে হুদূদ অর্ডিন্যান্স জারী করেছে। তথা চুরি করলে হাত কাটা হবে, যেনা করলে রজম করা হবে ইত্যাদি। আমি বলব, এই হুদূদ অর্ডিন্যান্সের ঘোষণার মাধ্যমে সে কামলিওয়ালের সুন্নাতের মজাক উড়িয়েছে। কামলিওয়ালে যখন হুদূদুল্লাহ জারি করেছিল তখন মদীনাতে কোনও গুনাহ বাকী ছিল না। আর আজ! পাকিস্তান পাপের স্থান হয়ে গেছে। জিয়াউল হক্ব এই দেশের জড়কে তছনছ করে দিয়েছে। এবার শুনো হুদূদের দাস্তান। কিভাবে সে রাসূলের হুদূদের মজাক উড়িয়েছে? সব চেয়ে বড় হদ বা সাজা হচ্ছে যেনার সাজা। হে সিআইডির সদস্যরা লেখ! আর নিজেদের গুরুদেরকে রিপোর্ট কর, 'যাও ওকে গিয়ে বল! ইহসান ইলাহী বলেছে, তুই মিথ্যুক ছিলি, বেদ্বীন ছিলি'।

একদিকে যেনার সাজা নির্ধারণ করেছিস আর অন্যদিকে পতিতালয়য়ের লাইসেন্স দিয়ে রেখেছিস। এইতো কয়েকদিন আগে লাহোর হাইকোর্টে পাঞ্জাবের একটি বস্তি রিট দায়ের করেছে যে, তাদের এলাকাতে থানা কায়েম করার মাধ্যমে তাদের কর্মীদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে। হাইকোর্ট রিট কবুল করেছে। বস্তি ওয়ালাদের অনুমতি আছে যেনার। আর অন্য দিকে যেনার সাজা নির্ধারণ। সুবহানাল্লাহ!!

এবার শুনো মদের দাস্তান। কৃওমী এসেম্বলিতে এই সরকারের কৃষিমন্ত্রী মদ উৎপাদনের যে হিসাব দিয়েছে, তাতে ৮৬ সালে যত মদ উৎপাদন হয়েছে অতীত ৩৯ বছরে এত শরাব কোনোদিন উৎপাদন হয়নি। শুনো! আমার নেতা কি বলেছে? মুনাফিকের তিন আলামাত। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে। এ তো কা'বা ঘরের গিলাফ ধরে ওয়াদা করেছিল। ৯০ দিনের জন্য ক্ষমতায় এসেছিল, এখন তো ৯ বছর পার হয়ে গেল তাও ক্ষমতা ছাড়ে না।

সে আরো কি করেছে, যাকাত ও ওশরের কানূন জারী করেছে। আর এই কানূনকে ওলামাদেরকে সরকারী ও দরবারী বানানোর জন্য ব্যবহার করেছে। একটি আশ্চর্য ঘটনা শুনো! মনোযোগ দিয়ে শুনো! সারা দেশের মসজিদে যাকাতের টাকা আসত। আমার মসজিদে বছরে আশি হাযার দিত। কিন্তু যখন নামধারী আমীরুল মুমিনীন জানতে পারলেন যে, এটা ইহসান ইলাহী যহীরের মসজিদ তখন বললেন, যাকাত বন্ধ করে দাও। অথবা ওকে বল হক বলা ছেড়ে দিতে। আমি বললাম, 'ওরে জাহেল! তুই তো আমাকে চিনতেই পারিসনি'। কা'বার রবের কসম! এই আশি হাযার কেন? আশি লাখ হোক, চায় আশি কোটি বা আশি বিলিয়ন একদিকে হোক আর মুহাম্মাদের কথা একদিকে হোক, আমি ইহসান ইলাহী যহীর এই আশি হাযারকে পায়ের নিচে পিষ্ট করব, পদদলিত করব'।

আমি মাদরাসা বোর্ডকে বলেছি, জিয়াউল হক্ব বলে, আশি হাযার নাও, হক্ব বলা ছেড়ে দাও। ওকে বলে দাও, ইহসান ইলাহী যহীর জময়তে আহলেহাদীছ থেকে দান উঠিয়ে ৮০ লাখ দিয়ে দিবে তুই আমাদের পিছন ছেড়ে দে। আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নাও আশি লাখ। আমাদেরকে ছেড়ে দাও। শুনে রাখ! তুমি এ যুলুম করেছ। যাকাতের হুকুম জারী করেছ। আর মানুষকে দলবদ্ধভাবে এক জামা'আতের দিকে পাঠানোর চেষ্টা করেছ। আমি নাম নিচ্ছি না (শী'আ)। এ দলবদ্ধভাবে মানুষকে ঐ জামা'আতের দিকে পাঠিয়েছে। কিভাবে? মানুষকে বলতে শুরু করেছে তুমি বল তুমি অমুক (তথা তুমি বল যে, তুমি শী'আ, তাহলে তোমাকে যাকাত দেয়া লাগবে না)। আমি ইসলামাবাদে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছি,'জিয়াউল হক্ব! ক্বিয়ামতের দিন হবে। আম্মা আয়েশার হাত হবে আর তোর কাঁধ হবে। আম্মা আয়েশা বলবে, জিয়াউল হক্ব! তুই নিজের ক্ষমতার জন্য আমার আব্বাকে গালি দিয়েছিস'। উপস্থিতি! এ ইসলামকে অপমান করেছে। দেশের নিয়মকে অপমান করেছে। এমনকি মার্শাল 'ল'কে বদনাম করেছে। এ এত ভাল যে, যেদিকে এর পা যায় সেদিকে শুধু বদনাম আর বদনাম। আর শুনে রাখ! আল্লাহ্‌র রহমতে আহলেহাদীছ আজ জেগে উঠেছে। ও! বলো! আহলেহাদীছ আজ জেগে উঠেছে। আহলেহাদীছ আজ জেগে উঠেছে।

সম্মানিত উপস্থিতি! এই রকমের গাদ্দারের কথায় আহলেহাদীছরা ধোঁকা খেতে পারে না। এখন আমরা লড়ব আল্লাহ্‌র কুরআনের জন্য। ও! বলো! আমরা লড়ব আল্লাহ্‌র কুরআনের জন্য। দাঁড়িয়ে বলো! আমরা লড়ব আল্লাহ্‌র কুরআনের জন্য। রাসূলের সুন্নাতের জন্য।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন-আমীন!!

[অনুবাদক : ছাত্র, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী

পরশপাথর

মার্কিন নও-মুসলিম অ্যারোন সেলার্স-এর ইসলাম গ্রহণ

ন্যায়বিচার, শান্তি, বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব এবং চারিত্রিক ও নৈতিক সৌন্দর্য মানুষের প্রকৃতিগত বিষয়। আর এসব বিষয় ইসলামী শিক্ষা ও আইনের ছায়াতলে পাওয়া যায় বলেই মানব জাতির মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে এই মহান ধর্ম। পাশ্চাত্যবাসীরা ইসলামকে উগ্র ও সহিংসতাবাদী ধর্ম বলে তুলে ধরার চেষ্টা করলেও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এটা বুঝতে পারছেন যে, ইসলাম শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, মুক্তি ও সৌভাগ্যের ধর্ম এবং এ ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত চাহিদাগুলো মেটাতে পারে। বেলজিয়ামে অবস্থিত আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থা 'সি ইন্টারন্যাশনাল' জানিয়েছে, '২০১০ থেকে ২০১১ সালে ইউরোপে ইসলামে দীক্ষিতের হার ছিল শতকরা ১৭ ভাগ'। অতীতের যে কোনো বছরের তুলনায় ইউরোপে ইসলামে দীক্ষিতের এই হার সবচেয়ে বেশি। ফ্রান্সের জনমত জরিপ সংস্থা 'আইএফওপি' ইউরোপের সবচেয়ে বড় গবেষণা সংস্থাগুলোর অন্যতম। সংস্থাটি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, 'গত দশ বছরে ইউরোপের বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ব্রিটেন, জার্মানী, হল্যান্ড ও ফ্রান্সের বিপুল সংখ্যক নাগরিক ইসলামকে ইউরোপের চিরাচরিত খ্রিস্টান পরিচিতির প্রতি হুমকি বলে মনে করা সত্ত্বেও এবং ইউরোপের ইসলামীকরণের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়া সত্ত্বেও এই মহাদেশে ইসলামে দীক্ষিতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে'। সংস্থাটি আরো জানিয়েছে, 'ফ্রান্স ও ব্রিটেনের ৩৫ বছরের কম বয়সী যুব সমাজের একটা বিশাল অংশ মনে করেন ইসলাম তাদের জীবনের সাংস্কৃতিক দিক জোরদার করছে'। তাদের মতে, 'ইসলাম ইউরোপকে এমন এক নতুন যুগে উন্নীত করতে পারে, যার অভিজ্ঞতা ইউরোপ অতীতে কখনও লাভ করেনি'।

> 'পশ্চিমা প্রচারণার বিপরীতে ইসলাম নরঘাতক ও সন্ত্রাসী গড়ে তোলে না; বরং ইসলাম মানুষ ও প্রকৃতির এবং জানা ও অজানা সব সৃষ্টির আসল ধর্ম। যারা আল্লাহ্র ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে শান্তি ও সৌভাগ্যের সন্ধান করে তারাই প্রকৃত মুসলিম'।

মার্কিন নও-মুসলিম অ্যারোন সেলার্স মনে করেন, 'আল্লাহ চেয়েছিলেন বলেই তিনি মুসলিম হতে পেরেছেন। কারণ আল্লাহই মানুষের অন্তরে বিপ্লব সৃষ্টি করেন এবং মানুষকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন। কয়েকটি মানসিক বা আত্মিক ঘটনার পর খ্রিস্টান পরিবারে বড় হওয়া সেলার্স একটি আশ্রয়ের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। তিনি বলেছেন, 'শৈশবে জন্ম নেয়ার সময়েই আল্লাহ-পরিচিতির প্রথম বীজ বোনা হয়েছিল আমার অস্তিত্বের মধ্যে। মা ছোটবেলায় বাইবেলের কাহিনীগুলো শোনাতেন। কিন্তু কৈশর শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লগ্নে আধ্যাত্মিক শিক্ষার রঙ্গ ম্লান হয়ে গিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটা জায়গা যেখানে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বড় হওয়ার সুবাদে অর্জিত ধর্মীয় জীবন সবাই ভুলে যায়, কিংবা আমার মত সেই জীবনকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখে। এরপর হোস্টেল বা ছাত্রাবাসে রাত জাগা, লাগামহীন জীবন, মদ ও পার্টির সহজলভ্যতা এসবই জীবনকে সংকীর্ণ করে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে গির্জাও ছিল না বলে তা নিয়ে আগ্রহও জাগত না। ফলে রবিবারগুলো হয়ে উঠেছিল অন্য দিনগুলোর মতই'।

অ্যারোন সেলার্স আরো বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে শিখেছি অনেক কিছুই, তবে একটি শিক্ষার অভিজ্ঞতা হয়েছিল মৃত্যুর মুখোমুখি অবস্থায়। অপ্রত্যাশিত সেই সময়ে শরীর ও মনের সব শক্তি ক্ষয়ে আসছিল এবং আত্মহত্যাকেই সমস্যার একমাত্র সমাধান বলে ভাবছিলাম। জীবনে আর কখনও এতটা শূন্যতা অনুভব করিনি। আমার অবস্থা ছিল যেন মূসা (আঃ) ও বনি-ইসরাঈলের মত, যাদের পেছনে ছিল ফেরাঊনের সেনাদল ও সামনে নীল নদ এবং বুঝতে পারছিলাম না যে কিভাবে দরিয়া পাড়ি দেব। ফলে মূসা (আঃ)-এর মত প্রার্থনার হাত তোলা ছাড়া আমারও কোনো উপায় ছিল না'।

মার্কিন নও-মুসলিম অ্যারোন সেলার্স তিনি তার জীবন সম্পর্কে বলেন, 'জীবনের অর্থহীনতা, উদ্দেশ্যহীনতা ও শূন্যতার ধারণা যখন আমাকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দিচ্ছিল তখন আবারও ওয়াশিংটনে আমার কৈশরের সেই গির্জায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার মধ্যে আবারও ধর্ম-বিশ্বাস জোরালো হওয়ায় আত্মহত্যার চিন্তা বাদ দেই। মনে হয় স্বল্প সময়ের জন্য আত্মহত্যার সেই চিন্তাটা এসেছিল স্রষ্টা বা আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাওয়ার জন্যই। পরিবর্তিত এ অবস্থা আমার জীবনের নতুন লক্ষ্য সৃষ্টি করে ও উৎসাহ বেড়ে যায়। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ে কোনো ধরনের পূর্বানুমান বা অযৌক্তিক ভাবাবেগমুক্ত আচরণ করতে লাগলাম। আমার মনে হয় আমার এই অবস্থার কারণেই নিরেট সত্য তথা ইসলাম গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল আমার মনের মধ্যে'।

তিনি নিতান্ত কৌতূহল বা আনন্দের জন্যই বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে পড়াশুনা শুরু করেন। প্রথমেই 'মানুষের ধর্ম' শীর্ষক বইটি তার হাতে আসে। বইটির প্রথম অধ্যায়ে ইসলাম সম্পর্কিত আলোচনা সেলার্সকে স্তম্ভিত করে। এ আলোচনায় উল্লেখিত ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যে ব্যাপক সম্পর্ক তার কাছে

ছিল অবিশ্বাস্য। বইটির ঐ অধ্যায়ে প্রামাণ্য তথ্য তুলে ধরে বলা হয় যে, ইসলাম ইবরাহীম (আঃ)-এর আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত সত্য ধর্ম। আর এই ধর্ম প্রচারিত হয়েছে ওই মহান নবীর বড় ছেলে ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে। এইসব তথ্য ইসলাম সম্পর্কে আরো গভীরভাবে জানার আগ্রহ জাগিয়ে তোলে সেলার্সের মধ্যে। এরপর তিনি বৌদ্ধ, হিন্দু, ইহূদী ও অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে পড়াশুনার সিদ্ধান্ত নেন। বৌদ্ধ ধর্মে পার্থিব জীবনকে খুব বেশি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা

হয়েছে, অন্যদিকে পরকাল সম্পর্কেও এ ধর্মের স্পষ্ট বক্তব্য নেই। হিন্দু ধর্মে ইবাদত বা উপাসনা খুবই অগোছালো প্রকৃতির এবং এসব উপাসনার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকাঠামো নেই। এছাড়াও হিন্দুদের ঈশ্বর বা উপাস্যগুলো অনবরত বিভিন্ন রূপ ধারণ করে।

সেলার্সের কাছে ইহূদী ধর্মের মূলনীতিগুলোকে সঠিক মনে হয়েছিল, তবে ধর্মটির মধ্যে খুব মাত্রাতিরিক্তভাবে জাতিগত বিদ্বেষও তার চোখে পড়েছে। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস বা চিন্তাধারা ও আচার-অনুষ্ঠানগুলো তার কাছে সত্যিকার অর্থেই বিশ্বজনীন বলে মনে হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে সময় পর্যন্ত সেলার্সের কাছে ইসলাম সম্পর্কে যেসব তথ্য ছিল তা ধর্মান্তরের জন্য যথেষ্ট ছিল না বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু পবিত্র কুরআন পড়ার পর এ মহাগ্রন্থের বক্তব্য তার কাছে এমন জ্যোতির্ময় আলো বলে মনে হয়েছে যে, মনে-প্রাণে মুসলিম হওয়ার জন্য খুব একটা দূরত্ব আর অবশিষ্ট থাকেনি।

মার্কিন নও-মুসলিম অ্যারোন সেলার্স সঙ্গীত সামগ্রীর একটি দোকানে চাকরি করতেন। একদিন এক পুরানো ও স্থায়ী ক্রেতা তাকে ইংরেজীতে অনূদিত পবিত্র কুরআনের একটি কপি উপহার দেন। অ্যারোন সেলার্স এ প্রসঙ্গে বলেন, 'কুরআন পেয়ে আমি খুব পুলক অনুভব করেছিলাম। দেরি না করেই কুরআনের মাঝামাঝি জায়গা খুললাম যাতে ঈসা (আঃ) সম্পর্কিত আয়াত পড়া যায়। আমি ঈসা (আঃ)-এর ভালবাসা নিয়ে বড় হয়েছিলাম।তাই কুরআন এ মহাপুরুষ সম্পর্কে কি বলে তা জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। মনে মনে বললাম, কুরআনে যদি ঈসা (আঃ)-কে কোনোভাবে সমালোচনা করা হয় বা তার ওপর অনাস্থা আনা হয় তাহলে কুরআন পড়া বন্ধ করে দেব এবং ইসলাম নিয়ে আমার আর কোনো আগ্রহই থাকবে না। কিন্তু কুরআনে পড়লাম। আল্লাহ কেবলই এক, তাঁর কোনো শরিক নেই ও নেই কোনো তুলনা এবং ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র একজন নবী ও বান্দা। এভাবে কুরআনে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে ঈসা (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে দেখে কুরআন অধ্যয়নের ও ইসলাম সম্পর্কে আমার জানার আগ্রহ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। বেশ কিছু দিন ধরে গভীর পড়াশুনা, আলোচনা ও গবেষণায় মেতে রইলাম। আমার আত্মাই শুরু করেছিল নানা প্রশ্নের জবাব খোঁজার কাজ। চাচ্ছিলাম সত্য স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত অনুসন্ধান ও গবেষণা অব্যাহত রাখব, যাতে নিশ্চিত হতে পারি যে ইসলামকে সঠিকভাবেই বুঝতে পারছি। ফলে পবিত্র গ্রন্থ কুরআন সম্পর্কে আরো গভীরভাবে পর্যালোচনা বা পুনর্মূল্যায়ন শুরু করি এবং মুক্তির পথ পেয়ে যাই'।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 'হে মানবকুল! তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এবং এতে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়াত ও রহমত' *(ইউনুস/১০/৫৭)*।

কুরআনের এই আয়াত পড়ার পর নিজের মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন অনুভব করেন সেলার্স। আর এ সময়ই তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। বাসার অদূরে অবস্থিত মসজিদে গিয়ে সাক্ষ্য দেন যে, 'এক আল্লাহ ছাড়া কেউ কোনো মা'বূদ বা উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই; মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানবজাতির জন্য

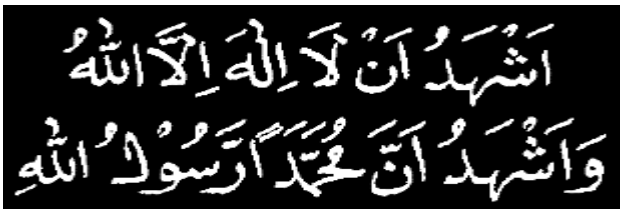

তাঁর সর্বশেষ নবী এবং কিয়ামত বা পুনরুত্থানের আগ পর্যন্ত কুরআন সর্বশেষ এলাহী গ্রন্থ বা অহী'। যখন ঘরে ফিরে এলেন তখন অনুভব করছিলেন অপার প্রশান্তি। সেদিনই জীবনে প্রথমবারের মত প্রকৃত প্রশান্তি অনুভব করেছিলেন বলে সেলার্স উল্লেখ করেন।

ধীরে ধীরে জোরদার হল তার ঈমান। আর ইসলামী বিধানগুলো মেনে চলতে চলতে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে,

'পশ্চিমা প্রচারণার বিপরীতে ইসলাম নরঘাতক ও সন্ত্রাসী গড়ে তোলে না; বরং ইসলাম মানুষ ও প্রকৃতির এবং জানা ও অজানা সব সৃষ্টির আসল ধর্ম। যারা আল্লাহ্র ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে শান্তি ও সৌভাগ্যের সন্ধান করে তারাই মুসলিম'। আর এভাবেই আমি সত্যিকারের সাফল্য ও মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছি বলে মার্কিন নও-মুসলিম সেলার্স উল্লেখ করেন।

শিক্ষণীয় বিষয় :

(ক) সত্য অনুসন্ধানে সর্বদা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

(খ) শৈশবকালের শিক্ষার উপর একটি মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালিত হয়ে থাকে। অতএব শৈশবেই ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদাগত ও আদর্শগত শিক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(গ) নতুন কোন বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকলে তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়টিও জানতে হবে।

(ঘ) পবিত্র কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জেনে নিবিষ্ট মনে নিয়মতি অধ্যয়ন করা ও মেনে চলা।

মাওলানা ইসহাক ভাট্টির সাথে কিছুক্ষণ

৫ই ডিসেম্বর ২০১৪। লাহোরের সকালটা কুয়াশায় ধূসর হয়ে আছে। রাভী রোডের বাত্তী চকে এসে জমা হওয়া চক্রাকার রাস্তাগুলো তখনও বেশ সুনসান। যাত্রী শূন্য দু'একটা লাল মেট্রোবাস অলসভাবে মোড় নিচ্ছে। মেইন রোডের পার্শ্বেই অবস্থিত মারকাযী জমঈয়ত আহলেহাদীছের ৩ তলা অফিস ভবনটির ছাদে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখছি। আর সাজিয়ে নিচ্ছি দিনের পরিকল্পনা। আজ সাক্ষাৎ করার কথা প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও লেখক মাওলানা ইসহাক ভাট্টি'র সাথে। গতকাল শীশ মহল রোডের সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকা অফিস থেকে তাঁর সাথে যোগাযোগ করে সময় নেয়া হয়েছে সকাল ৯টায়। উনি আমাদেরকে তাঁর বাসায় সকালে নাশতার দাওয়াত দিয়েছেন। রাতটা জমঈয়ত অফিসের মেহমানখানায় কাটিয়েছি। এখন অপেক্ষা করছি সকালটা একটু তেতে ওঠার।

খানিক বাদে নীচে নেমে আব্দুর রাযযাক ভাইকে ঘুম থেকে জোর করে উঠালাম। তারপর ৮টার দিকে একটা সিএনজি নিয়ে রওনা হলাম লাহোর রিং রোড ধরে। গন্তব্য সান্দা টাউনের ইসলামিয়া কলোনী। প্রায় আধা ঘণ্টা চলার পর সান্দা ফুটওভারব্রীজের সামনে এসে নামলাম। তারপর ছোটখাটো এক বিড়ম্বনা। ঠিকানা মোতাবেক এ-গলি সে-গলি ঘুরে বাসা খুঁজে পেলাম না। ফোন দিলাম মাওলানা ইসহাক ভাট্টির ছোটভাই সাঈদ ভাট্টিকে। উনি বললেন, 'থোড়ি দের ইন্তিযার কিজিয়ে চক পে, মে আভী আ রাহা হুঁ..'। সেই যে দাঁড়িয়ে থাকলাম, ঝাড়া পৌনে এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, উনার খবর নেই। উনি আমাদের খোঁজেন, আমরা উনাকে খুঁজি। কিন্তু নাগাল পাই না কেউ কারোর। অবশেষে বিরক্তি যখন সপ্তমে, তখন লুকোচুরি খেলার অবসান হল। কালো রোদচশমা চোখে ছোটখাটো আধা বৃদ্ধ মানুষটা হাযির হলেন। উনার আন্তরিক হাসি আর দুঃখপ্রকাশে মুহূর্তেই বিরক্তিটা স্বস্তিতে রূপান্তরিত হল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে এক ঘুপচি গলির মধ্যে দোতলা পুরনো বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। সদর দরজার উপর পাথর ফলকে লেখা 'মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি'। ছোট্ট ড্রইং রুমে ঢোকা যায় সরাসরি রাস্তা থেকেই। দরজা খুলার পর ভিতরে ঢুকে বসলাম। চারিদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম মাওলানার জীবনযাত্রা অতি সাদাসিধে আটপৌরে। ঘরে তেমন কিছু নেই। মাওলানার বসার জন্য একটি টেবিল। সামনে দু'জোড়া সোফা পাতা। আর রয়েছে পুরোনো বই-পত্রিকায় ভরা একটা কাঠের আলমারী।

একটু পরেই নবতিপর বৃদ্ধ মাওলানা আসলেন। ছোটখাটো একহারা গড়ন। ঘন সাদা দাড়ি আর চোখে উচ্চ পাওয়ারের ভারি চশমা। তবে বয়স যে নব্বই অতিক্রম করেছে, তা দেখে বুঝা যায় না। চেহারায় জ্বলজ্বল করছে সারল্য, নম্রতা আর বিনয়ের প্রগাঢ় ছাপ। প্রথম কথাতেই জিজ্ঞাসা করলেন, সাথে আর কেউ আসেনি? না সূচক জবাব দিলে তিনি বারবার দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। একটু ক্ষোভ ঝেড়ে বলে গেলেন, 'জমঈয়ত' অফিস থেকে কিংবা 'আল-ই'তিছাম' অফিস থেকে কাউকে তো আপনাদের সাথে আসার দরকার ছিল, তাহ'লে বাসা খুঁজতে এত হয়রানি হ'তে হয় না.. আমাদের আহলেহাদীছদের মধ্যে আসলে মেহমানকে কদর করার গুণটা অনেক কম.. আমার কাছে পাকিস্তান ও ভারতের অনেক হানাফী আলেমই আসেন, তাদের সাথে দেখি কত স্থানীয় আলেম এবং গুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত থাকে...আর আপনারা 'জমঈয়ত' অফিস থেকেই আসলেন অথচ একাকী!! মেহমানের প্রতি আদব-কায়দা আহলেহাদীছদের মধ্যে দিন দিন কমে যাচ্ছে!' আমরা মাওলানাকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম, 'আসলে জমঈয়ত অফিসে এত সকালে কেউ আসেনি বা কারো সাথে আমাদের দেখাও হয়নি, এজন্য হয়ত কেউ সঙ্গ দিতে পারেননি, আপনি রাগ করবেন না'। আমাদের কথা হয়ত উনার কানে গেল না। রাগত ভঙ্গিতে মাথা নেড়েই গেলেন।

একটু পর নাশতা এল। নান রুটি, ডিম, পায়েস আর চা। খেতে খেতে মাওলানাকে বললাম, আপনার বাসায় দাওয়াত পেয়ে আমরা খুব খুশী হয়েছি এবং ভাগ্যবান বোধ করছি। কারণ কোন পাকিস্তানীর বাসায় পূর্বনির্ধারিত দাওয়াতে অংশ নেয়া এ দেশে আসার পর আমার এটাই প্রথম। আর সেটা আপনার বাসায় হওয়াতে আরও ভাল লাগছে। মাওলানার চেহারাটা এক মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও পরক্ষণেই গম্ভীর দেখাল। জানিনা আগের প্রসঙ্গটা ভেবে কিছুটা বিব্রতও হলেন কি-না!

নাশতার পর বিস্তারিত খোঁজ নিলেন বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অবস্থা সম্পর্কে। দুই যুগ পূর্বে আব্বার সাথে লাহোরে দেখা হওয়ার স্মৃতিটা প্রথমে ঠিক মনে করতে পারছিলেন না। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তারপর মনে পড়লে খুব খুশী হলেন। খোঁজ-খবর জানতে চাইলেন। থিসিসটা উর্দূতে অনুবাদ করার জন্য বিশেষ তাকীদ দিলেন।

এত বয়স সত্ত্বেও মাশাআল্লাহ মাওলানার শরীর-স্বাস্থ্য এবং স্মৃতিশক্তি প্রায় অটুট রয়েছে। শুধু কানে কিছুটা কম শোনেন। এজন্য কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে তাঁর ভাইয়ের সাহায্য নিতে হ'ল। মাওলানার স্ত্রী মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে। সন্তান বলতে দুই মেয়ে। দু'জনই বিবাহিতা। ফলে বাড়ীতে এখন তিনি একাই থাকেন। তাঁর দেখাশোনা করেন ছোট ভাই অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী সাঈদ ভাট্টি। তিনি সপরিবারেই তাঁর সাথে এই বাড়িতে থাকেন। তাই বিশেষ কোন সমস্যা হচ্ছে না।

আত-তাহরীকের জন্য একটি সাক্ষাৎকার দিতে অনুরোধ করলাম। উনি খুশীমনেই রাযী হলেন। সাক্ষাৎকারের ফাঁকে ফাঁকে প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসে স্মৃতির পাতায় জমানো নানা অজানা গল্প। লক্ষ্য করলাম নিজের কোন অর্জনের প্রসঙ্গ আসলে তিনি খুব সতর্কতার সাথে এড়িয়ে যাচ্ছেন। নিজেকে যথাসম্ভব গৌণ করে দেখাতেই যে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তা বুঝা গেল। জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইতিহাস রচনার প্রতি তাঁর আগ্রহের প্রেক্ষাপট, সমকালীন ইতিহাস এবং বিশেষতঃ আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ইত্যাদি সম্পর্কে। তাঁর সাফ জবাব, এতে তাঁর ব্যক্তিগত কোন কৃতিত্ব নেই। 'ইদারায়ে ছাকাফায়ে ইসলামিয়া' (লাহোর)-এর রিসার্চ ফেলো হিসাবে কাজ করার সময় দায়িত্বের অংশ হিসাবেই ইতিহাস বিষয়ক লেখালেখিতে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। তা থেকেই ইতিহাসের প্রতি ভাল লাগা শুরু। তারপর 'আল-ই'তিছাম' ও 'আল-মা'আরিফ' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালনকালে ঘটনা পরম্পরায় ইতিহাসই হয়ে পড়েছে তাঁর লেখালেখির মূল উপজীব্য।

জানতে চাইলাম, তাঁর ইতিহাস গবেষণা ভারত উপমহাদেশ কেন্দ্রিক হলেও তাঁর গ্রন্থ সমূহে বাংলাদেশী ওলামায়ে কেরামের নাম তেমন একটা উচ্চারিত না হওয়ার কারণ কী। উনি নির্দ্বিধায় বললেন, আসলে বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরাম সম্পর্কে উর্দূতে তেমন কোন বই পাওয়া যায় না। ফলে বাঙালী আলেমদের সম্পর্কে আমি প্রায় অন্ধকারেই। তাঁদের সাথে আমার তেমন সম্পর্কও হয়নি। বাংলাদেশে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল খুব। একবার কলকাতা পর্যন্ত গিয়েছিলামও। কিন্তু বাংলাদেশে আর যাওয়া হয়নি। এ পর্যায়ে তিনি একটু দোষারোপ করেন আমেরিকা প্রবাসী তাফসীরে ইবনে কাছীরের বাংলা অনুবাদক জনাব প্রফেসর ড. মুজীবুর রহমানকে। বললেন, আমি অনেকবার অনুজপ্রতীম ড. মুজীবুর রহমানকে বলেছি উর্দূতে বাংলাদেশের আহলেহাদীছ আলেমদের খেদমত সম্পর্কে একটি বই লিখতে নতুবা আমাকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে। কিন্তু তিনি তা করেননি।

সময় গড়িয়ে যেতে থাকে। বেলা সাড়ে বারটা বাজলে টনক নড়ে। জুম'আর দিন। ছালাতের সময় হ'তে আর বাকি নেই। বিদায়ের আগে মাওলানা ছাহেব তাঁর 'বার্রে ছাগীর মেঁ আহলেহাদীছ কি আওয়ালিয়াত' বইটি আমাদের দু'জনকে হাদিয়া দিলেন। বইটি অনুবাদের জন্য বাংলাদেশ থেকে নূরুল ইসলাম ভাই অনুমতি চেয়েছিলেন। উনি বললেন, এটা তো আমার জন্য সুসংবাদ। এমন শুভ কাজের জন্য অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই। আমাকে কেবল একটি কপি দিলেই কৃতজ্ঞ থাকব।

উনার একটি বড় রেজিস্ট্রার খাতা আছে। যেখানে তিনি বহু মানুষের ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে রেখেছেন। ইতিহাসবিদ হিসাবে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনেই হয়তো। সেখানে আমাদের পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী উভয় ঠিকানা এবং ফোন নম্বর বিস্তারিত লিখে নিলেন। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস লিখতে গেলে সঠিক তথ্য সংগ্রহে কতটা যত্নবান হতে হয়, তার কিছুটা শেখা হ'ল মাওলানার রেজিস্ট্রার খাতাটি দেখে।

মাওলানার যে দিকটি সবচেয়ে নযর কাড়ল তা হল তাঁর অতিশয় লাজনম্রভাব এবং সাদাসিধে জীবনযাপন। পুরোনো বাড়িটা এমনই পুরোনো যে, বিদ্যুৎ চলে গেলে সেখানে জমে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিদ্যুৎ আসার পরও সে অন্ধকার যেন যেতে চায় না। বার্ধক্যের প্রান্তসীমায় এসে পরিবারহীন প্রায় একাকী জীবন। কিন্তু তাতে তিক্ততার কোন আভাস পাওয়া যায় না। হাসেন প্রাণখুলে। কথাও বলেন মনখুলে। প্রশান্তি ছুঁয়ে যায়। বয়সের ভার তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে অল্পই। এখনও আছেন টানা লেখালেখির মধ্যে। বর্তমানে ব্যস্ত আছেন ওকাড়ার সুপ্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ পরিবার 'লাখভী' পরিবারের ইতিহাস রচনায়।

এই প্রবীণ বয়সে একজন কীর্তিমান মানুষ যে এতটা বিনয় ধরে রাখতে পারেন, তা তাঁকে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। যে বইটি হাদিয়া দিলেন, তার উপর আপন হস্তাক্ষরে লিখে দিলেন 'আযীযুল ক্বদর আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ছাহেব কি খেদমত মে নেহায়েত ইহতিরাম কে সাথ'–ইসহাক ভাট্টি'। নাতিরও ছেলের বয়সী একজনের উদ্দেশ্যে তিনি যে সম্ভ্রমসূচক বাক্যসমষ্টি ব্যবহার করলেন, তাতে খুব লজ্জিত বোধ করলেও বিস্মিত হইনি। তিনি যে কেমন মানুষ তা আগেই বোঝা হয়ে গেছে। এ বেলায় কেবল তাঁর এই বিনয়ভাব যে কতটা নিখাদ এবং বাইরে-ভিতরে সমানভাবে সমুজ্জ্বল, তা-ই মধুরভাবে প্রকাশ পেল কালির অক্ষরে। মাওলানার দো'আ নিয়ে এবং তাঁর উষ্ণ আলিঙ্গনের পরশ মেখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসলাম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাওলানার বাড়ীটির দিকে নযর বুলালাম আরেক বার। কীর্তির যে অনুপম রাজপ্রাসাদ গড়েছেন তিনি, তার ঔজ্জ্বল্য মেখে চুন-সুরকী খসা পুরোনো বাড়িটা হঠাৎ রাজবাড়ীর মতই ঝলমলিয়ে উঠে চোখের সামনে।

লেখক : আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
এম.এস (হাদীছ), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

প্রচলিত দ্বীন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(আট)

(ক) জন্মদাতা পিতার অনুরোধের প্রেক্ষিতে জানিয়েছিলাম, ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতা মেয়ে পেলে বিয়েতে আমার কোন আপত্তি নেই। তিনি অনেক চেষ্টার পরও এ রকম পাত্রীর ব্যবস্থা করতে না পারলেও স্নাতক পরীক্ষার্থী এক ধার্মিক মেয়েকে আমার জন্য নির্বাচন করেন। পাত্রী ১৯৯৫ সনে আমার ঘরে এসে প্রথম সাক্ষাতেই আমার কাছে জানতে চান 'তাবলীগী নেছাব' আমি কতবার খতম করেছি এবং জীবনে কতবার চিল্লা দিয়েছি? আমার ধর্মীয় অনুরাগের অনেক গল্প তিনি ইতিপূর্বে শুনেছেন। অথচ বাস্তবে আমার অজ্ঞতার কথা শুনে তিনি কিছুটা হলেও মনক্ষুণ্ন হন। অথচ আমার বেডরুমে চারটি সেলফ ভর্তি দেশী-বিদেশী তাফসীর, হাদীছ, ফিকহসহ বিভিন্ন বিষয়ের কিতাবাদি সাজানো ছিল। আর টেবিলে রাখা ছিল ছহীহ বুখারীর একটি খণ্ড। এ সব কিতাব দেখে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। আমি ছহীহ বুখারী হাতে নিয়ে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী, হাদীছ সংগ্রহের ইতিহাস ও ইন্তিকাল পরবর্তী কারামাত সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করি। তিনি জানতে চান- বইটি কী তাবলীগী নেছাবের চেয়েও মূল্যবান? নেছাবের মহান লেখকের চেয়ে এ বইয়ের লেখকের মর্যাদা কি বেশী? আমি বিষয়টি নিয়ে আর আলোচনা না করে তাকে শুধু এ কথা বলি যে, ইসলাম সম্পর্কে তোমাকে আরও জানতে হবে।

আমাদের বিয়েতে আগমনকারী একজন মহামান্য অতিথি তথা জনপ্রতিনিধি সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাই। তিনি বললেন, এ অতিথি হলেন তার আত্মীয়। বাল্যকাল থেকে এই ব্যক্তি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং রাজনৈতিকভাবে আমাদের সবার প্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের একজন অগ্রসৈনিক। তিনি মিথ্যা কথা এমন সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারেন, মনে হয় তা সত্যি। এছাড়া কোন কাজ সম্পাদনের জন্য তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে যে প্রকারেই হোক ছলে-বলে-কৌশলে তিনি তা সম্পাদন করেই ছাড়েন। এসব গুণের জন্য আপনজনদের সবাই তাঁকে নির্বাচনে দাঁড় করান এবং পরবর্তীতে তিনি একজন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

আমাদের বিয়েতে আগমনকারী আরেকজন অতিথি সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে চাই। তিনি বললেন, এ অতিথিও হলেন তাঁর নিকটাত্মীয়। বাল্যকাল থেকে এই ব্যক্তি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, রাজনীতিকে খুবই ঘৃণা করেন। একজন দাঈ ইলাল্লাহ হিসাবে নিয়মিত তাবলীগের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। পরকালই তাঁর কাছে মুখ্য, ইহকালের ঝামেলা থেকে নিজেকে সব সময় মুক্ত রাখেন। কখনও মিথ্যা বলেন না। দুনিয়াটা জ্বলে-পুড়ে গেলেও তিনি ঐ দিকে দৃকপাত করেন না। তাই সবাই তাঁকে জামে মসজিদের ইমাম হিসাবে নিয়োগ করেন।

আমি তার কাছে জানতে চাই ওমর (রাঃ)-এর নাম তিনি শুনেছেন কি-না? হ্যাঁ, তিনি ছিলেন মহানবী (ছাঃ)-এর অত্যন্ত প্রিয় সহচর। আমি বললাম, তিনিতো ছিলেন অর্ধ পৃথিবীর শাসনকর্তা তথা জনপ্রতিনিধি এবং মসজিদে নববীর ইমাম। ওমরতো ঐ দু'জনের কারো মতোই ছিলেন না, ছিলেন সত্যবাদী এবং অত্যন্ত প্রতাপশালী শাসনকর্তা। আমার মুখনিসৃত এ কথা শুনে তিনি আঁতকে ওঠে বললেন, না না; তা হতে পারে না। মহানবীর একজন ছাহাবী সম্বন্ধে এমন বাজে কথা বলাটা হবে বড়ই গুনাহের কাজ। জনগণের দাবী পূরণকল্পে জনপ্রতিনিধিকে বিভিন্ন কৌশল তথা মিথ্যা বলা, হিসাব বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেখান, প্রয়োজনে প্রতারণা, শঠতা সহ বিভিন্ন কাজ করতে হয়। ওমর (রাঃ) কখনও মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণা ও শঠতার প্রশ্নই আসে না। আমি আবারও পূর্বের কথাটি শুনাই যে, ইসলাম সম্পর্কে তোমাকে আরও জানতে হবে।

তবে তাঁকে একজন আবেদা এবং সুগৃহিনী হিসাবে পাই। তিনি মহান প্রভুকে খুশী ও রাযী করার জন্য প্রায় রাত জেগে ছালাত আদায় করেন। 'কুরআন মাজীদ নাযিল করা হয়েছে, তা বুঝে পড়ে আমাদের জীবনকে সংশোধন করার লক্ষ্যে। আর এর মাঝেই নিহিত রয়েছে আমাদের ইহ ও পরকালীন কল্যাণ' কথাটি তাঁকে বুঝাতে আমার বছরখানেক সময় লেগেছিল। অবশ্য আমার প্রথম পুত্র হিফয সম্পূর্ণ করে এখন মাদরাসায় অধ্যয়নরত। কন্যাটিও মাদরাসায় পড়ছে। তারা কুরআন-হাদীছ পড়ে, তাদের রয়েছে আলাদ আলাদা বুক সেলফ। আর তিনিও আপাতত বাংলায় অনূদিত কুরআন পড়েন।

(খ) আমার কাছে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে এক ভাই মাঝে মধ্যে আসেন। বয়সে তিনি আমার বছর দশেকের বড়। বর্তমানে অবসর জীবন-যাপনরত স্নাতক ডিগ্রীধারী ভাইজান বিগত জীবনের ত্রিশটি বছর একজন দাঈ ইলাল্লাহ হিসাবে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে মাঝেমধ্যে মসজিদে দ্বীনের আলোচনায় একজন শ্রোতা হিসাবে অংশগ্রহণ করি। সময়ের পরিক্রমায় তাঁর সাথে ঘনিষ্টতা তৈরী হয়। তিনি অবসর পেলে আমার কাছে আসেন, মাঝেমধ্যে আমিও তাঁর বাসায় যাই। চলার পথে দ্বীন সংক্রান্ত তাঁর অজ্ঞতা আমার কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ভুল শুধরে দেয়ার সাহস আমার হয়ে ওঠে না, কেননা আমি এখনও কোন চিল্লা বা নেছাবের খতম দিইনি। তাবলীগীরা মনে করেন, চিল্লাবিহীন ব্যক্তি দ্বীনের দাড়িপাল্লায় শিশুতুল্য। আমার কথা মেনে নেয়ার মত মানসিকতা তাঁর নেই বলে আমি মনে করি।

তিনি চব্বিশ ঘন্টার সময়কে তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। এক ভাগ অর্থাৎ আট ঘন্টা মহান প্রভুর এবাদত-বন্দেগীর জন্য, এক ভাগ দুনিয়াদারীর জন্য ও অন্যভাগ ঘুমের জন্য। তিনি তাঁর মতের সমর্থনে বিভিন্ন যুক্তি আমার কাছে তুলে ধরেন। আমি তাকে বললাম, আমি তো চব্বিশ ঘণ্টাই মহান প্রভুর এবাদত-বন্দেগী করি। তিনি আমার কথা শুনে অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকালেন। জানতে চাইলেন, তাহলে কী আপনি ঘুমান না বা খাওয়া-দাওয়া করেন না? আমি বললাম, আমার ঘুম এবং খাওয়া-দাওয়া সব কিছুই এবাদতের অন্তর্ভুক্ত? তিনি মন্তব্য করলেন, যে আমার কথাটা না-কি 'অযৌক্তিক'।

আমি তাকে বাংলায় অনূদিত কুরআন ও হাদীছ পড়ার জন্য অনুরোধ করি। এ জন্য আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থেকে সঊদী আরবে মুদ্রিত বাংলা 'মাআরেফুল কোরআন' পড়তে দিই। তিনি হাতে নিয়ে জানতে চান, এটি নেছাবের কোন খণ্ড? আমি 'তরজমায়ে কুরআন' বলতেই তিনি আশ্চর্য হয়ে বলেন, না না; তা হতে পারে না। কুরআনে কারীমের সাথে বেআদবী হবে। এটি তেলাওয়াত করা যাবে, তরজমা-তাফসীর পড়বে আলিমরা। আমরা যারা আরবী ভাষা ও আরবী ব্যাকরণ জানি না তারা পড়তে গেলে ভুল হবে, পাপ হবে। লাখ-কোটি ছওয়াব অর্জনের পদ্ধতির বিবরণ নেছাবে আছে। এর থেকে বেশী কিছু জানতে গিয়ে নিজের জীবনটাকে বরবাদ করতে চাই না।

আমি তাকে বললাম, বেআদবী হবে মনে করে হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ ব্রাহ্মণ ছাড়া হাত দেয় না। আমাদের ধর্মগ্রন্থ এ রকম নয়। শুধু ব্রাহ্মণ নয়, এটি সবার জন্য উন্মুক্ত। এটি নাযিল হয়েছে আমাদের জীবন সংশোধনের জন্য। তিনি আমার কথা মানলেন না। তাঁর মতে দ্বীনের বাইরে জীবন-যাপনের অন্য কোন কাজে আমার নির্দেশ তিনি নির্দ্বিধায় মেনে নেবেন। তবে মহান প্রভুর মহাগ্রন্থ নিয়ে কোন বেআদবী করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

(গ) একদা উক্ত বড় ভাইয়ের বাসায় গিয়ে তাকে ছালাতে মগ্ন দেখতে পাই। সব সময় তাকে ধীর-স্থিরভাবে ছালাত আদায় করতে দেখেছি। আজ দেখছি এর ব্যতিক্রম। অতি দ্রুত সালাম ফিরিয়েই সাথে সাথে আবার নতুন করে রাক'আত বাঁধেন। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে একবার সালাম ফিরানোর সাথে সাথেই এই নতুন নিয়মের ছালাতের বিবরণ জানতে চাইলাম। তিনি জানালেন যে, তাবলীগী নেছাবের এক স্থানে পেয়েছেন 'জনৈক বুযুর্গ প্রতিদিন এক হাযার রাক'আত ছালাত পড়তেন'। তাই তিনি বুযুর্গের মত একদিনে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় এক হাযার রাক'আত ছালাত আদায়ের চেষ্টা করছেন। বিদায় নিয়ে ঐ দিন চলে এলাম। দু'দিন পর ভাইজান আমার কাছে এসে জানালেন, সব রকমের চেষ্টা করেও এক দিনে তিনি এক হাযার রাক'আত ছালাত আদায় করতে পারেননি। কিভাবে সে বযুর্গ এক দিনে এক হাযার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন এ নিয়ে তিনি বিস্মিত। আমি তাকে হিসাব করে দেখালাম যে, একদিন=২৪ ঘণ্টা। আর ২৪ ঘণ্টা=১৪৪০ মিনিট। আর ১৪৪০ মিনিটে রক্ত মাংসে গড়া কোন মানুষের পক্ষে সর্বকনিষ্ঠ সূরা বা আয়াত দিয়ে হলেও এক হাযার রাক'আত ছালাত পড়া সম্ভব নয়। এছাড়াও মানুষের চাহিদা রয়েছে পেশাব-পায়খানা, ওযূ-ইস্তেঞ্জা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদির। দীর্ঘ দিন পরে হলেও আমি আজ তাকে এ কথাটি বুঝাতে সক্ষম হলাম যে, 'আলোচ্য অতি পবিত্র (!) গ্রন্থে বর্ণিত জনৈক বুযুর্গের কথাটি সঠিক নয়। আর পৃথিবীর মাঝে একমাত্র বিশুদ্ধ গ্রন্থটি হচ্ছে মহান রাব্বুল আলামীনের বাণী কুরআনে কারীম। এরপর আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে মহানবী (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ। এ দু'টি গ্রন্থ ছাড়া বাকী যে কোন বুযুর্গের কথা বা লেখা নিঃসঙ্কোচে যাচাই-বাছাই না করে মেনে নেয়া যাবে না। আর যাচাই-বাছাইয়ের মীযান বা দাঁড়িপাল্লা হল কুবআন ও হাদীছ। দ্বীন শিখতে হবে এ দু'টি গ্রন্থ থেকে। ঐ সব বই-পুস্তক থেকে নয়। হ্যাঁ, এ দু'টি গ্রন্থ পড়ার পর সময়-সুযোগ পেলে কুরআন-হাদীছের দাঁড়িপাল্লায় উত্তীর্ণ অন্যান্য বইপত্র এমনকি তাবলীগী নেছাবও পড়তে কোন আপত্তি নেই।

(গ) সম্প্রতি আমার এক নিকটাত্মীয়াকে কনে হিসাবে পাত্র পক্ষ দেখতে আসে। কনের বাবা ছিলেন তাবলীগের একান্ত অনুসারী এবং রাজনৈতিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের সমর্থক। মরহুম ভদ্রলোক স্বীয় সন্তানদের পরকালীন মুক্তির জন্য তাবলীগের ধর্মীয় নীতি ও ইহকালীন সফলতার জন্য আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ

নীতি তথা উভয় নীতির সমন্বয়ে গড়তে সচেষ্ট ছিলেন। সন্তানরা পরকালীন দিকটা নিয়ে এখনও ভাবেনি অর্থাৎ তাদের বয়স এখনও কম। তাই তারা ইহকালীন সফলতার জন্য পিতার দেখিয়ে দেয়া আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে গ্রহণ করেছে। কনের মাতা মনে করেন এই স্বল্পকালীন ইহজীবন অতি গৌণ বিষয়। পরকালই তার কাছে মুখ্য। তাই তিনি পরকালের যাত্রায় নাজাত পেতে স্বামীর দেখিয়ে দেয়া পথে অর্থাৎ তাবলীগের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। রাত জেগে ছালাত পড়েন ও নিয়মিত নফল ছিয়াম রাখেন।

বিয়ের আলোচনার সে অনুষ্ঠানে আমি কনে পক্ষের একজন আত্মীয় হিসাবে গমন করি। আমার স্ত্রী আমাকে বিদায় দেয়ার পূর্বে পাত্রের পিতা সম্পর্কে আমাকে কিছু ব্রিফ করেন। প্রবাসে অবস্থানরত এ পাত্রের পিতা হলেন অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি। পুরো রামাযান মাস মসজিদে কাটান। কখনও তাহাজ্জুদ ও ইশরাকের ছালাদ বাদ দেন না। একজন দাঈ ইলাল্লাহ হিসাবে রয়েছে এলাকায় তাঁর যথেষ্ট কদর। আর কনের মরহুম পিতার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেতো আমার রয়েছে যথেষ্ট জানাশোনা।

সুধী পাঠক! পাঞ্জাবী-পায়জামা ও সুন্নাতি টুপি পরিহিত, হাতে তাসবীহ, পকেটে মিসওয়াকওয়ালা সত্তরোর্ধ এ ভদ্রলোক তার প্রবাসে অবস্থানরত পুত্রের ২৭ জন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কনে দেখতে এসেছেন। দু'টি ভিডিও ক্যামেরাসহ সবার সাথেই রয়েছে অত্যাধুনিক মোবাইল ফোন। প্রথমেই আমি ভদ্রলোককে অতিথিদের সাথে পরিচয়পর্বের অনুরোধ করি। তিনি সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেন যে, এ হল আমার গাড়ীর ড্রাইভার, ও হল আমার পুত্রের বন্ধু, ও হল আমার পুত্রের বন্ধুর বড় ভাই, আর এ ছেলেটি পেশায় ভিডিও ক্যামেরাম্যান হলেও আমার পুত্রের এক সময়ের সহপাঠী ইত্যাদি। তিনি এও জানালেন যে, এখানে আসা অতিথিদের সবাই তাঁর 'আপনজন'। এখানে 'বাইরের' কাউকে তিনি নিয়ে আসেননি। 'কনেকে কে কে দেখতে পারেন' বলে আমি ইসলামের বিধান সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করি এবং শরী'আতের দৃষ্টিতে 'আপনজন'-এর সংজ্ঞা ভদ্রলোকের কাছে জানতে চাই। দর্শক গ্যালারী থেকে আওয়াজ আসে দেখতে লোকটাকে আধুনিক ও শিক্ষিত মনে হলেও সে হলো একটা Backdated person। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই আসে কনের মায়ের ডাক। ভিতরের রুমে গিয়ে তার কাছ থেকে শুনলাম যে, পাত্র ও তার পিতা যেভাবে চাইছেন আমরা সেভাবেই মেয়েকে দেখাতে চায়। দয়া করে তুমি এ বিষয়ে প্রশ্ন করে তাদেরকে বিব্রত কর না।

কয়েক মিনিট পর আমার স্ত্রীর ফোন আসে। তিনি আমাকে জানান যে, পাত্রের পিতা একজন বয়স্ক বুযুর্গ-আবেদ। তার মত একজন বুযুর্গের সাথে কোন বিষয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়া কাবীরা গোনাহের কাজ। তিনি আরও বললেন, একজন প্রতিষ্ঠিত সিটিজেন পাত্রের পাত্রী পসন্দের এ অনুষ্ঠানে ধর্মের কথা বলে তুমি কোন ঝামেলা তৈরী কর না। পবিত্র ধর্ম গ্রন্থের যত্রতত্র ব্যবহার ধর্মগ্রন্থের অবমাননার শামিল। কুরআন-হাদীছের কথা তুমি ছালাত আদায়ের পর মসজিদে আলোচনা করবে, বিয়ের অনুষ্ঠানে নয়। তোমার পায়ে ধরি, তুমি এমন কাজটি কর না। অতঃপর আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে সামাজিক বিধি মোতাবেক অনুষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম সুসম্পন্ন হয়।

(ঘ) বিগত ২০০৪ সনে অসুস্থ এক মহিলা তাঁর নয় বছরের একটি পুত্রকে আমার কাছে নিয়ে আসেন। মাস দুয়েক পূর্বে তার রিক্সা শ্রমিক স্বামী ইন্তেকাল করেছেন। তার যুবতী কন্যা একটি ক্লিনিকে সাত শত টাকা বেতনে সুইপারের কাজ করে। আমি যদি শিশুটিকে ফুটফরমায়েশের কাজে নিয়োগ করি তবে তিনি একটু স্বস্তি পাবেন। পাঁচ শত টাকা ভাড়ায় তিনি একটি ঝুপড়ি ঘরে থাকেন; অনুরোধ করেন, আমি যেন শিশুটিকে মাস শেষে বাসা ভাড়ার এ টাকা দিই। আবুল কালাম আযাদ নামক শিশুটিকে আমি আমার দোকানে রাখি এবং মহিলার কথামত মাস শেষে পাঁচ শত টাকা দিয়ে যাচ্ছিলাম।

বছরখানেক পর আবুল কালাম আযাদের বড় বোন ক্লিনিক থেকে ফেরার পথে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এসে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। কাঁদার কারণ জানতে চাইলে মেয়েটি জানাল, বিগত দু'মাস সে মা ও ভাইকে নিয়ে প্রায় উপোস করে বাবার মৃত্যু দিবসে মিলাদ-ক্বিয়াম পড়াতে এবং হুযুরদেরকে দাওয়াত খাওয়াতে পাঁচশত টাকা জমিয়েছিল। কিন্তু গত সপ্তাহে মা অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছিল। ঔষধ বাবদ এই টাকাগুলো খরচ হয়ে গেছে। মিলাদ করাতে না পারার কারণে বাবার আত্মা তাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে এ কারণেই সে কাঁদছে।

[লেখক : মঈনুল হক্ব মঈন, চট্টগ্রাম]

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

মালিকা পর্বতের গুপ্তধন সয়ফুল মুলক ঝিলে

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

গত বছরের মাঝামাঝি সময়ের কথা। ইসলামাবাদে মে মাস থেকে প্রচণ্ড গরম পড়েছে। তাপমাত্রা প্রায়ই ছুঁয়ে যাচ্ছে ৪৫ ডিগ্রি। হোস্টেলের ছোট্ট রুমটাতে গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে কি যে অস্থির হয়ে পড়ছিলাম! সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হতেই তাই সিদ্ধান্ত নিলাম উত্তরাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত শীতল গিলগিত-বালতিস্থান অঞ্চলে ক'দিনের জন্য ঘুরে আসব। বালতিস্তানের রাজধানী স্কারডুতে অবস্থিত সুপরিচিত আহলেহাদীছ মাদরাসা 'জামে'আ দারুল উলুম বালতিস্তান, গোয়াড়ী'র বেশ ক'জন শিক্ষক ও ছাত্রের সাথে পরিচয় হয়েছিল। তাদের সাথে যোগাযোগ করে মধ্য জুনের এক সকালে বের হলাম স্কারডুর উদ্দেশ্যে। ইসলামাবাদ থেকে প্রায় ৮০০ কি.মি. দূরত্ব। ওদিকে সারাবছরই প্রায় শীতকাল থাকে। আর ২/১ মাস থাকে গরমকাল, তবে সেটাও আমাদের দেশের স্বাভাবিক শীতকালের মত। পুরোটাই পাহাড়ী অঞ্চল। এভারেস্টের পর বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কে-টুসহ ৪টি এইট থাউজান্ডার (৮০০০ মিটারের উর্ধ্বে) পর্বতশৃঙ্গ এবং প্রায় ৬০টি ৭ হাযার মিটার উচ্চতার পর্বতশৃঙ্গের অবস্থান সেখানে।

স্কারডু যাওয়ার দু'টি রাস্তা আছে। একটা কারাকোরাম হাইওয়ে ধরে, অপরটি নারান-কাগানের পর্বতময় দুর্গম পথ ধরে। প্রচলিত কারাকোরাম হাইওয়ের পরিবর্তে ভাবলাম পাহাড়ী বনাঞ্চলের পথ ধরে যাই। তাহ'লে পুরো পথটাই দারুণ এক উপভোগ্য সফর হবে। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে রওয়ানা হয়ে প্রায় ৪ ঘণ্টার পথ পাড়ি দিয়ে প্রথমে মানসেহরা গেলাম। সেখান থেকে নারান উপত্যকাগামী এক মাইক্রোতে চেপে বসলাম।

পাহাড়ী পথ। দু'পাশে আকাশেছোঁয়া পাহাড়, পাইন আর ওক গাছের সারি আর মাঝে ছোট্ট, অথচ প্রচণ্ড খরস্রোতা নদী কুনহার। ঘণ্টাখানিকের মধ্যে চেনা শহর বালাকোটে এসে পৌঁছলাম। গত এপ্রিলেই একবার ঘুরে গেছি। সবকিছু আগের মতই আছে। কেবল বর্ষার পানিতে কুনহার নদীর বেগটা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বালাকোট ব্রীজ পার হওয়ার পর গাড়ী পাহাড়ের গা বেয়ে ক্রমশ উপরের দিকে উঠতে থাকে। নীচের কুনহার নদীটাও ক্রমশ সরু হ'তে থাকে। রাস্তার পাশের খালি জায়গায় বাণিজ্যিকভাবে মধুর চাষ করা হচ্ছে। কৃত্রিম উপায়ে বানানো টিনের মৌচাকে ভর্তি পুরোটা পথ। শোগরান, পারাস, কাগান ভ্যালি হয়ে প্রায় ৯০ কি.মি. পথ পাহাড়ী রাজ্যের অপরূপ রূপসুধা উপভোগ করতে করতে নারান পৌঁছে গেলাম বিকাল ৫টার দিকে।

পথিমধ্যে সহযাত্রী হিসাবে পেশোয়ারের ৩ কলেজ ছাত্রকে পেয়েছিলাম। ওরা নারান নেমেই মালিকা পর্বত চূড়ার (উচ্চতা ৫২৯০ মিটার) কোলে অবস্থিত সাইফুল মুলক ঝিল (উচ্চতা ৩২২৪ মিটার) দেখার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছিল। আমিও ওদের সহযাত্রী হলাম। ১৮০০ রুপী দিয়ে একটা জীপ ভাড়া করা হল। পাহাড়ের গা ঘেষে যে রাস্তা দিয়ে চূড়া অভিমুখী যাত্রা শুরু হ'ল, ওটা গাড়ি চলাচলের উপযোগী রাস্তা নয়। সারা রাস্তায় বড় বড় পাথরের স্তূপে ভরা আর সেই সাথে হিমবাহ গলা ঝর্ণার পানির স্রোত। তার উপর দিয়ে গাড়ি যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে শুরু করল, তাতে আমরা আতংকিত হয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে রাস্তা একদম সরু হয়ে গেছে। পাথরে লেগে একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই গভীর খাঁদে গড়িয়ে পড়বে গাড়ী। ড্রাইভার তো গাড়ি চালাচ্ছে না, শক্তি খাটিয়ে গাড়ী সামলাতে রীতিমত যুদ্ধ করছে। তার রগ টানটান করে প্রতি মুহূর্তে আসন্ন ঝুঁকির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত চেহারা দেখে মনে হয় যেন কোন সৈনিক এ্যামবুশ করে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য অপেক্ষমান। মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে নেমে আসা প্রায় ৫-৬ মিটার উঁচু চওড়া গ্লেসিয়ার পথ আটকে রেখেছে। বরফ কেটে কোনরকম চালু রাখা হয়েছে রাস্তাটা। দু'পাশে উঁচু বরফের প্রাচীরের

মধ্য দিয়ে গাড়ি যখন যাচ্ছিল তখন ভেজা শীতল বাতাসে মনে হচ্ছিল আস্ত ফ্রিজের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা।

একেবারে চূড়ায় উঠার পর আসল সেই স্বর্গীয় মুহূর্তটি। নীল পানির বিশাল ঝিল বা লেক। আর ঝিযলের পটভূমিকায় মালিকা পর্বতের নর্থ ও সাউথ চূড়া এবং সেখান থেকে নেমে আসা অপরূপ শ্বেত-শুভ্র গ্লেসিয়ার। শেষ বিকেলের মনোমুগ্ধকর আলোয় স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে আছে সেই বরফমাখা পাহাড়ের কিছু অংশ। রূপকথার রাজ্যের মত সুন্দর এই স্থানটির নাম রূপকথার রাজপুত্র 'সাইফুল মুলকে'র নামানুসারে রাখা হয়েছে 'সাইফুল

মুলক ঝিল'। পৃথিবীর অন্যতম উঁচু ও সুন্দরতম লেক এটি। শীতকালে পুরোপুরি বরফ হয়ে যায়। গরমের সময় বরফ গলে গেলেও তাপমাত্রা থাকে হিমাংক বরাবর কিংবা কিছুটা নীচে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাসে দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল। মাফলার/চাদর গাড়িতে রেখে এসেছিলাম আলসেমি করে। এখন নীচে আসার

পর মনে হচ্ছে উপর পর্যন্ত উঠতে উঠতে ঠাণ্ডায় জমে বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলব। শুনেছি বাঙালী সাহিত্যিক জগলুল হায়দার আফ্রীকী এখানে এসেছিলেন গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনী 'সিন্ধু নিলাব দেশে'-এ এই ঝিলটির বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তখন তিনি এসেছিলেন ঘোড়ায় চড়ে। অদ্যবধি ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায়। তবে বিনিময়টা দিতে হয় বেশ চড়া।

প্রায় আধাঘণ্টা অবস্থানের পর আবার জীপে ফিরে আসলাম। সূর্য ডুবতে তখনও বেশ বাকি। দেড় ঘণ্টা পর পাহাড়ের নীচে শহরে এসে পৌঁছলাম রাত ৮টার দিকে। জিপের অনবরত ঝাঁকুনীতে আর প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শরীরের অবস্থা তখন একেবারে কাহিল। গাড়ি থেকে নেমে সেখানকার ঐতিহ্যবাহী শিক কাবাব খেয়ে পুনরায় ফিরতি পথে রওয়ানা হলাম। রাতে নারানেই থাকার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু জানতে পারলাম পাবলিক পরিবহন এখন বন্ধ রয়েছে। একান্ত যেতে হলে চিলাস পর্যন্ত প্রায় ২০০ কি.মি রাস্তা জীপ ভাড়া করে যেতে হবে। ফলে পরিকল্পনাগুলো ভজগট পাকিয়ে গেল। অবশেষে বালাকোটে রাত্রিযাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম। রাত ১২টার দিকে পৌঁছে গেলাম বালাকোটের পূর্বপরিচিত ফিল্ড হাসপাতালে। পরদিন সকালে নাদীম ভাই, এহসান ভাইদের সাথে দেখা হল। কাওয়াই থেকে আযীযুর রহমান ভাইও আসলেন। উনাকে সাথে নিয়ে মাওলানা ছিদ্দীক মুযাফফরাবাদী ছাহেবের বাসায় গেলাম। তাঁর সাথে দেখা হল। গতবার উনার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সেখান থেকে নাস্তা-পানি সেরে ইসলামাবাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। স্কারডু আর যাওয়া হল না। মানসেহরা ফিরে সেখান থেকে আবার অন্য রাস্তায় যেতে হবে। কিন্তু শরীরের অবস্থা তথৈবচ। তাই প্রোগ্রাম বাতিলই করতে হল। তবে ফিরে এলাম প্রকৃতির এক অনন্য সাধারণ বৈচিত্রের স্বাদ নিয়ে। ইসলামাবাদ যখন গ্রীষ্মের দহনে পুড়ছে তখন সেখান থেকে মাত্র ৩০০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত নারান-কাগানে বরফ শীতল ঠাণ্ডা! আবহাওয়ার কেমন রাত-দিন তফাৎ! পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলজুড়ে এমনই নৈসর্গিক বৈচিত্রের সন্ধান মেলে সারাবছর।

লেখক : এম.এস (হাদীছ), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদ,পাকিস্তান

সাকা হাফং-এর পথে

-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

বাংলাদেশের পাহাড়ী সৌন্দর্যের রাজধানী বান্দরবানে সর্বপ্রথম পা রেখেছিলাম ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে। গতর খাটানো সেই সফরে শারীরিকভাবে এত কষ্ট হয়েছিল যে নতুন করে আবার সেখানে যাওয়ার কথা ভাবার অবকাশ ছিল না। কিন্তু বছর ঘুরে শীত মৌসুম আসতেই আগের বছরের সেই মধুর স্মৃতিগুলো জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকল। দূর পাহাড়ের হাতছানি এমন ব্যাকুল করে তুলল যে সিদ্ধান্তটা পাকা না করে আর উপায় থাকল না। কিন্তু যাই কীভাবে? যুতসই সঙ্গী ছাড়া এমন দুর্গম সফরে বের হওয়াই মুশকিল। তাছাড়া ভ্রমণপিপাসু বড়ভাই আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবও দেশের বাইরে! অবশেষে অনেক ঝুট-ঝামেলা, দ্বিধা-সংশয়ের মধ্যেও পুরনো ভ্রমণসঙ্গী কাফী ভাই আর ছোটভাই তাওয়াবকে সাথে নিয়ে প্রোগ্রামটা সেট করেই ফেললাম। গতবার দেশের ২য় বা ৩য় সর্বোচ্চ পর্বতচূড়া কেওকারাডং পর্যন্ত গিয়েছিলাম। তবে এবারের লক্ষ্যটা আরও বড়। সর্বোচ্চ পর্বতচূড়া সাকা হাফং ছুঁতে হবে–এটাই প্রতিজ্ঞা। জীবনের প্রথম নিজে দায়িত্ব নিয়ে কোন সফরের নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছি। আত্মবিশ্বাসের প্রবল ঘাটতি টের পেলাম তাই পরতে পরতে।

যাত্রা শুরু..

সফরটা গতবারের চেয়েও প্রতিকূল। দুর্গম এলাকা বলে রান্না নিজেরাই করতে হবে। এমনকি ঘুমানোর আয়োজনও উন্মুক্ত পথে-ঘাটে। সুতরাং শুকনো খাবার, রান্নাবান্না ও রাতকাটানোর সামগ্রী নিয়ে এক বড় লাটবহর হয়ে গেল। নভেম্বর'১৪ এর ১০ তারিখ সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম ঢাকার উদ্দেশ্যে। পূর্বপরিচিত 'ভ্রমণ বাংলাদেশ' গ্রুপের আবুবকর ভাই ঢাকা-বান্দরবান ইউনিক পরিবহনের রাত ১০.১৫ টার বাসে আমাদের জন্য সিট বুকিং দিয়ে রেখেছিলেন। সন্ধ্যার পর আবুবকর ভাইয়ের ব্যক্তিগত টুরিজম সংস্থা 'ইকো ট্রাভেলার'-এর ফকিরাপুলস্থ অফিসে গেলাম। এই প্রথম সাক্ষাৎ হ'ল তাঁর সাথে। অসাধারণ আন্তরিকতা দেখালেন শ্মশ্রুমণ্ডিত এই আপাদমস্তক ভদ্রলোক ভাইটি। শুধু তাই নয়, গুগল আর্থে বিস্তারিত রুটম্যাপ দেখিয়ে দিলেন এবং বান্দরবানে ফোন করে স্বল্প খরচে একজন গাইডও ঠিক করে দিলেন। ফলে আমাদের কাজটা বেশ সহজ হয়ে গেল। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বান্দরবানের উদ্দেশ্যে গাড়িতে উঠলাম।

পরদিন সাত সকালে আমরা বান্দরবানে এসে পৌঁছলাম। বাস থেকে নেমে সোজা থানচিগামী বাসস্ট্যাণ্ডে। তারপর বাসে চেপে বসলাম। মিনি সাইজের বাসটি পথচলা শুরু করতে না করতেই শুরু হ'ল চড়াই-উৎরাই। পাহাড়ের গা বেয়ে সর্পিল রাস্তায় বারবার উঠা-নামা। পাহাড়ী রাজ্যের এই অপরূপ সৌন্দর্য গতবার এসে দেখেছিলাম। পুরো বান্দরবানটাই এমন ছবির মতো থরে থরে সাজানো যে, বিশ্বাসই হতে চায় না এমন সুন্দর জায়গা দেশের মাটিতেই রয়েছে। অবচেতন মনেই বার বার মুখে তাসবীহ চলে আসে।

পথে চিম্বুকে বাস থামলে কফি খেলাম। নীলগিরিতে থামলেও সামনে বহু নীলগিরি অপেক্ষা করছে ভেবে আর নামলাম না। বলিপাড়ায় ১৫ মিনিটের জন্য থামলে হালকা কেনা-কাটা করে নিলাম। তারপর বান্দরবান থেকে প্রায় ৮৫ কি.মি. পূর্ব-দক্ষিণের শহর থানচিতে এসে যখন পৌঁছি, তখন দুপুর হয়ে গেছে। বাস থেকে নামতেই দেখা মিলল আমাদের পূর্বনির্ধারিত উপজাতীয় বৌদ্ধ গাইড অজিতের। সে আমাদের নিয়ে চলল সাঙ্গুর তীর ঘেঁষা তার পৈত্রিক নিবাসের পথে। সেখানে পৌঁছে অতিরিক্ত ব্যাগ-ব্যাগেজ সব তার বাড়িতে রেখে সাঙ্গু নদীতে গোসল সারলাম। স্থানীয় একটি মসজিদে ছালাত আদায় করার পর ইমাম ছাহেবকে একটা 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বই হাদিয়া দিলাম। মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দেখি এক বাচ্চা সুমিষ্ট স্বরে কুরআন তেলাওয়াত করছে। জানতে পারলাম এই একজন ছাত্র নিয়েই মসজিদের মুয়াযযিন ছাহেব হেফযখানাটি চালাচ্ছেন। উনার সাথে কথাবার্তা বলে বিকাল ৪টা নাগাদ রওয়ানা দিলাম বোর্ডিং পাড়ার উদ্দেশ্যে। যথারীতি পুলিশ ও বিডিআর অফিসে রিপোর্ট করতে হ'ল।

বোর্ডিংপাড়ার পথে..

সফর পরিকল্পনা অনুযায়ী বোর্ডিংপাড়া দিয়ে রওয়ানা হয়ে রেমাক্রি অতিক্রম করে সাঙ্গু নদী দিয়ে আবার থানচি ফিরে আসব। ২০০১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ উপযেলার ১৭ হাযার মানুষের মধ্যে মাত্র ১৩০০ মুসলিম। বাকীরা খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু এবং অন্যান্য। তবে মিশনারী তৎপরতায় খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাহাড়ে আরোহণের প্রথম ধাপটি হয় বেশ কষ্টকর। শরীর যেন সায় দিতে চায় না। কিন্তু পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে লুকিয়ে থাকা সীমাহীন মুগ্ধতার চুম্বকীয় আকর্ষণে কষ্টগুলো ধীরে ধীরে আড়াল হয়ে যায়। পাহাড়ের গা বেয়ে পাহাড়ীদের তৈরী চলার পথের পাশে কোথায় গভীর খাদ, কোথাও সরু পথ, কখনও পাহাড়ী ঝিরি। বড় গাছের গুড়ি ফেলে সেই ঝিরিগুলো পারাপারের ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে এ্যাডভেঞ্চারের সকল উপকরণ উপস্থিত। বিকাল ৫ টা পার হতে না হতেই চারপাশ অন্ধকার হয়ে এলো। টর্চ লাইট জ্বালিয়ে পথ চলতে লাগলাম। আশেপাশে কোন জনমানবের চিহ্ন নেই। নির্জন রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কেবল ঝি ঝি পোকার আওয়ায। মাঝে আগুন জ্বালিয়ে একটু জিরিয়ে নিলাম। অন্ধকার রাতে বনের গহীনে আগুনের লাল হলকার মাঝে একে অপরকে দেখে গুহামানবদের চিত্রটা মনে পড়ল। আবার টর্চ লাইটের মৃদু আলোয় যাত্রা। অবশেষে সন্ধ্যা ৭-টার পর আমরা গ্রামে পৌঁছালাম। 'ম্রো' উপজাতিদের এই পাড়াটি সুন্দর একটি পাহাড়ী ঝিরির পাশেই অবস্থিত। হাটু পানির ঝিরিতে হাত-পা ভিজিয়ে পাড়ায় ঢুকে পড়লাম। গাইড একটা বাড়ী ঠিক করে ফেললো। জনপ্রতি একশ টাকা দিয়েই এসব বাড়ীতে রাত্রিযাপন করা যায়। কাঠ আর বেতের নির্মিত ৩ রুমের বড় বাড়ীতে মা, ৩ ভাইবোন ও তাদের মোট ৯ ছেলেমেয়ের বিশাল সংসার। বেশ অবস্থাপন্ন মনে হ'ল। তারা না-কি কয়েকটি গয়ালের মালিক। তাই পাহাড়ী হিসাবে বড়লোক। সৌরবিদ্যুতের আলো পেয়ে খুব ভালো লাগলো। কারণ আলো পাব না ভেবে আমরা ৬টি টর্চ লাইট নিয়েছিলাম। জামা-কাপড় ছাড়তে গিয়ে দেখি কাফী ভাইয়ের গেঞ্জী রক্তাক্ত। জোকের আক্রমণ। গতবারের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বাড়ীওয়ালার কাছ থেকে চুলার ছাই নিয়ে লাগিয়ে দেয়া হ'ল। ব্যাস! রক্ত বন্ধ। সঙ্গে আনা চকলেট বাচ্চাদের মাঝে বিতরণ করলাম। ছালাত শেষে জানলাম খাবার হিসাবে চাল কুমড়ো, মিষ্টি কুমড়ো আর চাল ছাড়া কিছুই এখানে নেই। গাইড মিষ্টি কুমড়োর তরকারী আর ভাত রান্না করল। বাড়ীর ছোট্ট ছেলেটি কয়েকছড়া পাহাড়ী কলা দিয়ে গেল। খিদে পেটে খেলাম মোটামুটি। তারপর টয়লেট সারতে গিয়ে দেখি ঘোরতর বিপদ। কোন বাথরুমের ব্যবস্থা নেই। জঙ্গলেই কাজ সারতে হবে। সে এক দুর্বিষহ অবস্থা। গাইডের কাছে জানতে পারলাম, শূকরের প্রিয় খাবার হল মানুষের মল। তাদের কারণে এলাকায় কোন টয়লেট না থাকলেও পথে-ঘাটে কোন অপরিচ্ছন্নতা দেখা যায় না। পাহাড়ী জনপদগুলোতে সর্বত্রই মোটামুটি এই রকম চিত্র। ঘুমানোর সময় ওরা পাতলা কিছু কম্বল দিল। আর নিজেদের শীতের পোশাক ও কম্বল সব দিয়ে কোনরকম রাত্রিযাপন করলাম। শীতে ভালো ঘুম হ'ল না।

গভীর অরণ্যের পাহাড় 'তাজিনডং' :

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে বাড়ির মালিক লাল ছিয়ামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওয়ানা হলাম পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। তাজিনডং পর্বতচূড়া অতিক্রম করে থান্দুইপাড়ায় রাত্রি যাপন করার পরিকল্পনা। একের পর এক পাহাড় টপকাতে টপকাতে একটি পাহাড়ের চূড়ায় এসে উপস্থিত। সামনে আগানোর কোন পথ নেই। গাইড বলল বিশ্রাম নিয়ে নিন। সামনে বেকায়দা আছে। চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে পথ না পেয়ে পাহাড়ের কিনারায় এসে উঁকি দিয়ে দেখি খাড়া একটা নামার পথ। কিন্তু নামতে হবে স্রেফ খাঁজ কাটা গাছের গুড়ি ধরে। প্রায় ৩০ ফুটের মত দীর্ঘ। অনেকটা তালগাছ থেকে নামার মত। ভয়ে গা শিরশির করলেও আশাতীতভাবে বেশ দক্ষতার সাথেই সবাই নেমে পড়লাম। তারপর আবার যাত্রা শুরু। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখি

বেশ কিছু স্থানজুড়ে নাম না জানা নানা ফুলের বিরাট সমারোহ। গাইড জানালো পাহাড়ের এই স্থানে সারাবছর প্রাকৃতিকভাবে ফুল ফোঁটে। উৎসবের সময় পাহাড়ীরা এখানে ফুল নিতে আসে। ফুল বাগানের মাঝে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় যাত্রা শুরু করে বেলা ১২ টায় আমরা বম উপজাতিদের আবাসস্থল শেরকরপাড়ায় উপস্থিত হলাম। এ পর্যায়ে এসে শরীরে চরম ক্লান্তি এসে ভর করল। দুর্বলতা এমনভাবে গ্রাস করল যে সাকা হাফংয়ে না গিয়ে আশ-পাশের ঝর্ণাগুলি দেখে ফিরে যাওয়ার চিন্তা শুরু করলাম। কিন্তু কারবারীর দেওয়া চা খেয়ে কাফী ভাই হঠাৎ সতেজ হয়ে বসলেন। তার দৃঢ় ঘোষণা–কাংখিত লক্ষ্য অর্জন না করে সফর সংক্ষিপ্ত করার প্রশ্নই আসেনা। অবশেষে কাফী ভাইয়ের হার না মানা দৃঢ়তায় আমরা কিছুটা মানসিক শক্তি ফিরে পেলাম।

বেলা সাড়ে ১২টায় হাঁটা শুরু করলাম। এবার পাহাড় আরো উঁচু-নিচু। পাতলা ফতুয়া গায়ে থাকলেও ঘামে সারা গা জবজবে হয়ে থাকছে। সীমাহীন ক্লান্তিতে শরীর যেন ভেঙ্গে আসছে। প্রতি পদক্ষেপে মনে মনে বলছি, এই শেষ, আর জীবনে এসব পাহাড়ী পথ মাড়াবো না। বেলা আড়াইটায় আমরা অবশেষে তাজিনডং চূড়ায় পৌঁছাতে সক্ষম হলাম। কাঠ ও টিনের ছাউনি দিয়ে ছোট্ট একটা ঘেরাও করা আছে চূড়ার উপর। সরকারী হিসাবে এটিকে দেশের সর্বোচ্চ চূড়া বলা হ'লেও প্রকৃতপক্ষে প্রথম ১০টি চূড়ার মধ্যেও এটি নেই। জিপিএস রিডিং-এ এর উচ্চতা ৮৭১ মিটার বা ২৮৫৮ ফুট। তাজিনডং একটি মারমা শব্দ, যার অর্থ গভীর

তাজিনডং

অরণ্যের পাহাড়। সত্যিই এটা গভীর অরণ্যের পাহাড়। চূড়া থেকে আশপাশের প্রকৃতির বিবরণ ভাষায় প্রকাশ করা দায়। মনে হচ্ছে কেউ যেন নিজ হাতে বড় যত্নের সাথে প্রকৃতিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছে। সত্যিই বর্ণনাতীত। মিনিট পনের বিশ্রাম ও হাল্কা নাস্তার পর শুরু হ'ল আমাদের পরবর্তী যাত্রা। সামান্য দূরে আরেকটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত সিম্পলাম্পিপাড়া হয়ে আমরা থান্দুইপাড়ায় রাত্রিযাপন করব। বিকাল হয়ে আসায় প্রকৃতির রূপ যেন আরো ঝলমলিয়ে উঠেছে। কিন্তু উপভোগ করার জো নেই। দু-পাশে হাযার ফুট গভীর খাদ মাঝখানে পাথুরে সরু পথ। খুব সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে। একটু পর শুরু হ'ল জংগল। হঠাৎ বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে একপাল গয়াল উপস্থিত হ'ল। কিন্তু আগন্তুক দেখে বড্ড বিরক্ত হয়ে মাথা ঘুরিয়ে আবার জংগলে ঢুকে গেল।

সিম্পলাম্পিতে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার চললাম থান্দুইপাড়ার দিকে। এবার কেবল নামা। খাড়া পথে পাকা দেড় ঘণ্টা নামার পর সন্ধ্যা ৬ টায় থান্দুইপাড়া পৌঁছে একজনের বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। আগের গ্রামের মত এখানেও বাড়ী ভর্তি বিভিন্ন সাইজের বাচ্চা-কাচ্চা। সবার স্বাস্থ্য-চেহারা সুন্দর ও সুঠাম। মনে মনে ভাবলাম, এদেরকে আমরা সুবিধাবঞ্চিত বলি, অথচ প্রকৃতির কোলে এরাই বুঝি সবচেয়ে সুখী। তাছাড়া প্রতিটি আদম সন্তানকেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রূযী দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন এটাই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ এতগুলো সন্তান নিয়েও দিব্যি স্বচ্ছলতার সাথে দিনাতিপাত করছে। গাইড বলল, খ্রিষ্টান মিশনারীদের কথা আর কি বলব, এমনিই পাহাড়ে মানুষের অভাব। তা সত্ত্বেও তারা এখানে এসে পরিবার পরিকল্পনার গল্প ফাঁদে। পাহাড়ীরা এসবের ধার ধারে না। তাদের বিশ্বাস অধিক সন্তানেই প্রকৃত সুখ। যাইহোক সবাই গোল হয়ে বসে আমাদেরকে দেখছে। কাফী ভাই আজ নিজ হাতে পাহাড়ী মুরগী রান্না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গ্রাম থেকে একটা মুরগী কিনে চুলোয় চড়িয়ে দেয়া হল। রান্না শেষ হ'লে রাত ১০টায় খেতে বসলাম। খিদে পেটে গভীর আগ্রহ নিয়ে গোশতের উপর কামড় বসাতেই চমকে উঠলাম। এত স্বাদ! কাফী ভাইয়ের সুদক্ষ হাতের রান্না আজ সরাসরি আল্লাহ্র দেয়া নে'মত মনে হল। খাওয়া শেষ হওয়ার পর বাড়ির মালিক একগাদা নাম না জানা মাছ নিয়ে হাযির হলেন। পাশ্ববর্তী ঝর্ণাধারায় ফাঁদ পেতে ধরেছেন। তবে তখন আর রান্না করা বা খাওয়ার মুড ছিল না। রাতে টয়লেট সারতে দিয়ে টর্চের আলোয় দেখি বহু শূকর বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে এখানে-সেখানে ঘুমিয়ে রয়েছে। শূকরের গায়ের রং যে সাদাও হয় সেটা দেখলাম এই প্রথম। মজা পেলাম, বিশাল সাইজের শূকরের পেটের উপর মাথা দিয়ে সারিবদ্ধভাবে বাচ্চাদের ঘুমিয়ে থাকার দৃশ্য দেখে। টর্চলাইটের আলোয় মা শূকরের ঘুম ভেঙ্গে গেলেও নড়লো না একটুও। মনে হয় ঘুমন্ত বাচ্চাদের ডিস্টার্ব যাতে না হয় সেজন্য। রাত ১১টার দিকে ঘুমিয়ে গেলাম। রাতে এক ফাঁকে হঠাৎ ঘুম ভাঙলে চুলার ক্ষীণ আলোয় কাফী ভাইকে তাহাজ্জুদের ছালাতে দণ্ডায়মান দেখলাম। সফরের এই কষ্টের মধ্যেও তাকে তাহাজ্জুদ পড়তে দেখে মনটা ভরে গেল।

রেমাক্রির জলপ্রপাতে :

পরদিন নাস্তা সেরে সকাল ৮-টায় আমাদের তৃতীয় দিনের যাত্রা শুরু হল। ১০টায় নয়াচরণ পাড়ায় পৌঁছালাম। সেখানে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে হাঞ্জরাইপাড়ার দিকে অগ্রসর হলাম। বেশ খানিকটা নীচে হওয়ায় দূর থেকে পাড়াটি দৃষ্টিগোচর হয়। রেমাক্রি খালের

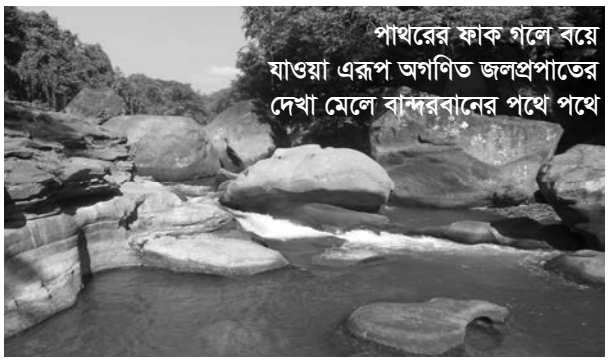

পাথরের ফাক গলে বয়ে যাওয়া এরূপ অগণিত জলপ্রপাতের দেখা মেলে বান্দরবানের পথে পথে

কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে মাত্র কয়েকটি ঘর নিয়ে ছবির মতো পাড়াটি। খালের অবিরাম কুল-কুল ধ্বনি এদের চিরসঙ্গী। ধীরে ধীরে নেমে এলাম খালের পাড়ে। দু'পাশে পাহাড়। মাঝখানে

বয়ে চলেছে খালের অবিরাম স্রোতধারা। বান্দরবানের পাহাড়ী সৌন্দর্যের মাঝে নদী, খাল, ঝর্ণার বয়ে চলা পানির কুলু-কূলু কলতান যে কতটা ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এসব দৃশ্য দেখার জন্যই তো এত কষ্ট স্বীকার করে এই পথ পাড়ি দেয়া। খালের পানিতে কিছুক্ষণ পা ভিজানোর পর তীর ধরে এগিয়ে চললাম। তীরে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল বিশাল পাথরের উপর দিয়ে কখনো ফাঁক দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে একসময় বেশ উঁচু একটি পাহাড় অতিক্রম করে পুনরায় খালে নেমে এলাম। এবার খাল ধীরে ধীরে নিচু হয়ে যাওয়ায় জলপ্রপাতে পরিণত হয়েছে। তাই পানি পতনের শব্দে পরিবেশ মুখরিত। একের পর এক পানিপতনের নান্দনিক দৃশ্য দেখতে বার বার পিছিয়ে যাচ্ছিলাম। অতঃপর একসময় পৌঁছালাম বেশ উঁচু থেকে নামা এক জলপ্রপাতের কাছে। বেলা ১১টা বাজে। তাই এখানেই গোসল করার সিদ্ধান্ত হল। ঝর্ণার সুশীতল পানি কাঁচের মতই স্বচ্ছ। অগভীর পানিতে বড়-ছোট পাথরের মেলা। বেশ পিচ্ছিল হলেও পাহাড়ে চলার উপযোগী স্যান্ডেল পরে নামায় তেমন অসুবিধা হচ্ছিল না। জলপ্রপাতের পতনস্থলে যেতে চাইলেও গাইডের ভয়-ভীতি প্রদর্শনে ফিরে আসলাম। কিন্তু কাফী ভাই নাছোড়বান্দা। যত বিপদই থাকুক ওখানে যাবেই। আমরা মানা করতেই স্মরণ করিয়ে দিল গতবারের কথা–'মনে আছে! গাইড ভয় দেখানো সত্ত্বেও ছাকিব ভাই জাদিপাই ঝর্ণায় নেমে গিয়েছিলেন, তারপর আমরাও সাথে নেমেছিলাম! সুতরাং ভয় করো না, এসো আমার সাথে। দেখি কি আছে ওর মধ্যে'। তারপর দেখি ঠিকই প্রবলবেগে উপর থেকে নেমে আসা স্রোতের মধ্যে বসে পড়েছে। আর দেখে কে! তাড়াহুড়া করে নেমে গেলাম। ভয়ে অস্থির তাওয়াব ভাইও ভয়-ডর ভুলে নেমে আসল। ওদিকে গাইড বেচারা বোকা বোকা হাসি হাসতে লাগলো। দু'পাশে উঁচু পাহাড়, মাঝখানে খরস্রোতা রেমাক্রির অপরূপ জলপ্রপাতের স্রোতধারায় গা এলিয়ে দিয়ে স্মরণীয় এক গোসল হয়ে গেল। স্রোতের টানে বারবার ভেসে যাওয়ার উপক্রম হলেও অবশেষে আনন্দের সবটুকুভাগ নিয়ে গোসল শেষ করলাম।

অরণ্যের গভীরে :

বেলা ১২-টার পর রওয়ানা হলাম নেপিউপাড়ার উদ্দেশ্যে। আবার শুরু হ'ল পাহাড় চড়া। তবে এবার উঠা-নামা না করে কেবল উঠতেই হচ্ছে। উপরে ওঠা মূলতঃ কষ্ট হলেও আমাদের লক্ষ্য যেহেতু সর্বোচ্চ চূড়া সাকা হাফং তাই ভাবছিলাম নামলেই তো আবার ওঠাও লাগবে। অতএব একেবারে ওঠাই ভাল। যাইহোক একটু পরে শুরু হ'ল অল্প অল্প পানি প্রবাহিত হয়ে একটি ঝিরি পথ। পাশ থেকে ভেসে আসছে নেপিউ ঝর্ণার রিম-ঝিম ধ্বনি। মাঝে মাঝে দেখাও হচ্ছে তার সাথে। ভর দুপুরেও জংগলের ঘনত্বের কারণে আঁধার নেমে যাচ্ছে কখনও। আমাজন জঙ্গলকে কল্পনা করার চেষ্টা করি মনে মনে। একসময় ঝিরি ছেড়ে এবার মূল পাহাড়ে চলে এলাম। বিশাল সাইজের উঁচু পাইন গাছ ভর্তি জঙ্গল। এক জায়গায় দেখি পাঁচটি গাছ একসাথে জড়িয়ে থেকে বেড়ে উঠেছে। মোটা দড়ির মত প্যাঁচানো এক জাতীয় শিকড় বিভিন্ন গাছ থেকে নেমে এসে আবার ওঠে গেছে। টারজানের মত এই দড়ি ধরে ঝুলে পড়তে ইচ্ছা হলেও সাহস হ'ল না। পথে হাযার হাযার পাকা চালতা ফল পড়ে আছে। কাফী ভাই আর গাইড অজিত লবণ দিয়ে কিছুটা খেল। বেলা সোয়া ২টায় আমরা কাংখিত নেপিউপাড়ার দেখা পেলাম। একজনের বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। এখান থেকে সাকা হাফং দেড় ঘণ্টার পথ। আজকের রাত্রিটা এখানেই পার করতে হবে। ভারী ব্যাগগুলো রেখে দিয়ে একটু বিশ্রাম নিতেই দেখি বাড়ির মালিক বিশাল সাইজের একটা পাকা পেপে গাছ থেকে কেটে নিয়ে হাযির। দাম বললেন ১২০ টাকা।

পেপে খাওয়ার পর ব্যাগ-ব্যাগেজ রেখে সামান্য কাপড় ও খাবার-দাবার বেঁধে নিয়ে রওয়ানা হলাম সাকা হাফংয়ের দিকে।

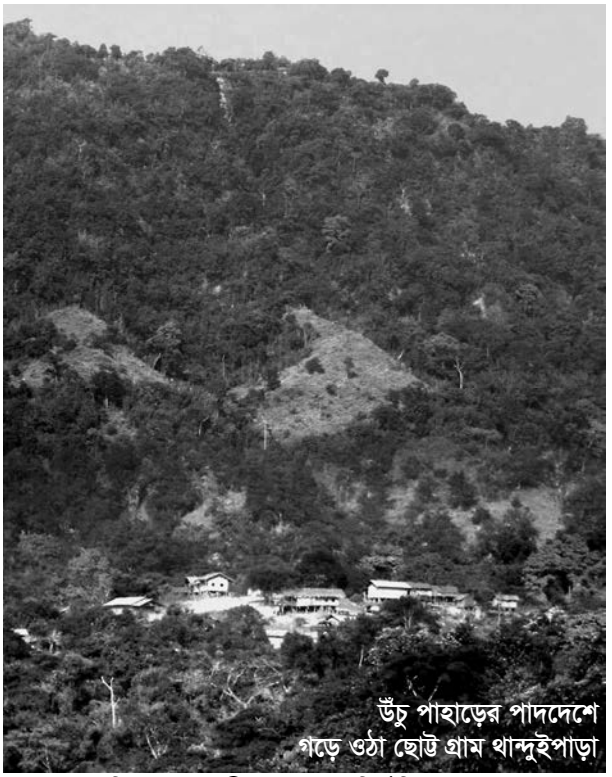

উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে গড়ে ওঠা ছোট্ট গ্রাম থান্দুইপাড়া

এখানকার নিয়ম অনুযায়ী আমাদের নির্ধারিত গাইড আর যাবে না। এই গ্রাম থেকে পৃথক গাইড নিয়ে যেতে হবে। বাড়ীর মালিকের ছেলে আমাদের সঙ্গী হ'ল। বাইরে এসে দেখি বিশাল সাইজের দু'টি শূকর জবাই করে আগুনে ঝলসে নিয়ে কাটাকাটির প্রস্তুতি চলছে। গত তিনদিন শূকর দেখতে দেখতে প্রাণীটির প্রতি ঘৃণার ভাবটা বোধ হয় কমে গেছে। নইলে এ দৃশ্য চোখে দেখাও দায় ছিল। গাইড বলল, জঙ্গলে পাতা ফাঁদে ধরা পড়েছে শূকর দু'টি। এদের নিয়ম অনুযায়ী জঙ্গলে ৫ কেজির উপরে মালিকানাহীন কোন পশু-প্রাণী গ্রামের কেউ ধরতে পারলে সবাই মিলে তা রান্না করবে এবং সেই বাড়ীতে পুরো গ্রামবাসীকে দাওয়াত করে খাওয়াতে হবে। ১০টি পরিবার ও ৭০ জন সদস্য নিয়ে গড়ে ওঠা ছোট্ট এই গ্রামটির মানুষগুলোর মধ্যে সমাজবদ্ধতার এই সুমধুর সুর উপলব্ধি করে সত্যিই ভালো লাগলো।

বিজয় সাকাহাফং :

বেলা ৩-টায় আমাদের যাত্রা শুরু হ'ল 'সাকা হাফং'-এর পথে। গল্পে গল্পে আমাদের নতুন গাইড ছেলেটির কাছে জানলাম এদের বিভিন্ন রীতি-নীতি। এরা জাতিতে মুরং এবং এদের ধর্ম 'গ্রামা'। তাদের প্রভু একজনই যিনি উপরে থাকেন। তবে গ্রামে প্রভুর চারজন প্রতিনিধি দেবতা আছে যাদেরকে তারা পূজা করে। এছাড়া 'সাকা হাফং' পাহাড়টিকেও তারা দেবতা হিসাবে পূজা

করে। গ্রামের কারবারীই এদের প্রধান। তার কথাতেই সবকিছু চলে। পাহাড়ে কেউ বিপদে পড়ে নির্দিষ্ট শব্দে ডাক দিলে গ্রামের শিশু-যুবক-বৃদ্ধ যে যেখানে আছে সবকিছু ফেলে সাহায্যের জন্য ছুটে আসবে এটাই পাহাড়ী অঞ্চলগুলোর প্রচলিত নিয়ম। এদের বিবাহরীতি অনেক জটিল। নগদ এক লক্ষ বিশ হাযার টাকা, কমপক্ষে চব্বিশ হাযার টাকা মূল্যের দু'টি শূকর এবং বিশটা মোরগ মেয়েকে দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করার পরই একটি ছেলে বিবাহ করতে পারে। সেকারণ আর্থিক সক্ষমতা না আসার আগ পর্যন্ত কেউ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে সাহস করে না। সেনাবাহিনীর অনুমতি নিয়ে পুরো পাহাড়ী অঞ্চলের যেখানে খুশী এরা বসতি স্থাপন করতে পারে। কোন পাহাড়ী ঝিরির পাশে সমতল স্থান দেখে এরা মূলতঃ বসতি স্থাপন করে। কারণ বেঁচে থাকা এবং পাহাড়ে জুম চাষের জন্য পানির সহজলভ্যতার কোন বিকল্প নেই।

উঠতে উঠতে একসময় মূল পথ ছেড়ে গভীর বাঁশ বনে ঢুকে পড়লাম। মূল পথটি দুর্গম হওয়ায় পাড়ার লোকেরা জঙ্গল কেটে কেটে নতুন একটা পথ বের করেছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘন বন হলেও পথটিতে তেমন কোন কঠিন ফাঁড়া পার হতে হয় না। সারাদিনের ক্লান্তিতে পায়ে পা জড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম হলেও সর্বোচ্চ চূড়া জয়ের স্বপ্ন, কাফী ভাইয়ের উৎসাহ সবমিলিয়ে শরীরটা টেনে উঠাতে লাগলাম। অবশেষে জংগল ছেড়ে খোলা আকাশের দেখা পেলাম। কাংখিত স্থান প্রায় সমাগত। অতঃপর বিকাল ৪টা ২০ মিনিটে আমরা বুনো জঙ্গল আর ঝোঁপ-ঝাড়ে ঘেরা সর্বোচ্চ চূড়া 'সাকা হাফং'-এ পৌঁছে গেলাম। থানচির দক্ষিণ-পূর্বে মদক রেঞ্জে মায়ানমারের একদম বর্ডার ঘেষে বাংলাদেশের সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ (৩৪৮৮ ফুট) এই চূড়াটির অবস্থান। ১৯৩৫ সালের ব্রিটিশ ম্যাপে চূড়াটির নাম দেওয়া

আছে 'মদক তোয়াং'। উচ্চতা লেখা আছে ৩৪৬৫ ফুট, কেওকারাডং এর চেয়ে প্রায় ৩০০ ফুট বেশী। থানচির গভীরে প্রায় সবকটি চূড়া থেকে এই চূড়াটি পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। স্থানীয় বমরা একে বলে 'তল্যাং ময়'। অর্থাৎ সুন্দর চূড়া। পাহাড়ের খুব কাছের গ্রাম শালুকিয়াপাড়ার 'ত্রিপুরা' উপজাতিরা একে ডাকে 'সাকা হাফং' বলে। যার অর্থ 'পূবের পাহাড়'। এই পুবের পাহাড়ে প্রথম অভিযাত্রী কোন বাঙালী নয়, একজন ব্রিটিশ অভিযাত্রী জীন ফুলেন। যিনি ১৯৪টি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে ১৪৯ টির সর্বোচ্চ পর্বত চূড়ায় আরোহণ করে রেকর্ড গড়েন। জীন ফুলেন এই রেকর্ড গড়ার অংশ হিসাবে ২০০৬ সালে থানচি এসে বাকলাই পাড়ার স্কুল শিক্ষক লাল-ময় বমকে নিয়ে প্রথমবারের মত এই চূড়ায় আরোহণ করেন। অতঃপর ২০০৭ সালে বাংলাদেশী ট্রেকাররা এটি জয় করেন।

এখান থেকে বান্দরবানের অধিকাংশ পাহাড়গুলো নিচু দেখা যায়। বাংলাদেশ অংশের পাহাড়ের পূর্ব পাশটা মায়ানমারের দিকে খাড়াভাবে নেমে গিয়ে অতন্দ্রপ্রহরীর মত এক অভেদ্য প্রাকৃতিক সীমানা প্রাচীর তৈরী করেছে। ওপারের পাহাড় আর এপারের চূড়ার মাঝে নিচের উপত্যকা তথা নো ম্যানস ল্যান্ড এত বিশাল যে নিশ্চিন্তে প্যারাগ্লাইডিং করে মিয়ানমারের কোন গ্রামে ল্যান্ড করা যাবে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পশ্চিম আকাশে অস্তগামী সূর্যের লাল আলোয় সামনের সবুজ পাহাড় উদার নীল আকাশ আর পাহাড়ের কোলে মায়ানমারের ছোট ছোট গ্রামগুলো অপরূপ হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির এমন নিষ্কলুষ সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়ালে সময়টা যেন স্থবির হয়ে যায়। অপলক নেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা হয়। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র একান্ত সৃষ্ট এ অপরূপ শোভার কি কোন তুলনা হয়! এরপরেও মানুষ কিভাবে তাঁর সমকক্ষ কাউকে ভাবতে পারে? এসব প্রশ্নের সত্যিই কোন উত্তর নেই।

চূড়ার উপর মিনিট বিশেক সময় ব্যয় করে খেজুর-বিস্কুট দিয়ে হাল্কা নাস্তা সেরে ফিরতি পথে নামতে শুরু করলাম। অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করায় গাইডের তাড়ায় দ্রুততার সাথে নামতে লাগলাম। বাঁশের শিকড়ে বার কয়েক হোঁচট খেলেও চূড়া জয়ের মানসিক প্রশান্তিতে সবকিছু ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সন্ধ্যা পৌনে ৬টায় আমরা নেপিউপাড়ায় পৌঁছে গেলাম। গিয়ে দেখি আমাদের নির্ধারিত বাসাতেই সেই শূকর খাওয়ার বিরাট আয়োজন বসেছে। তাই ঘরে না ঢুকে ঝিরিতে অযূ সেরে পাড়ে বসে আগুন জ্বালিয়ে শরীর গরম করতে লাগলাম। সেখানে দেখা হ'ল একই রূটে আসা ৭ জনের আরেকটি দলের গাইড বেলাল ভাইয়ের সাথে। ১১ বছর যাবৎ রুমা লাইনে গাইডের কাজ করছেন। খুব মিষ্টভাষী। বললেন আগামী কাল আমরা দুইদল একত্রে বের হব। ঐ দলটির সবাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের ছাত্র জেনে রাজি হয়ে গেলাম। বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা শেষে লোকজন মোটামুটি খালি হয়ে গেলে ঘরে প্রবেশ করে প্রথমেই আতর বের করে ভাল করে মেখে নিলাম। শূকরের গন্ধে একবার যদি অরুচি এসে যায় তবে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেওয়া লাগবে। মোরগ আনার অর্ডার দিলে মালিকের ছেলেটা ২ কেজি ২০০ গ্রাম ওজনের এক স্বাস্থ্যবান মোরগ নিয়ে হাযির হ'ল। ৩০০ টাকা কেজি দরে সুন্দর চেহারার মোরগটি পেয়ে কাফী ভাইতো বেজায় খুশী। দক্ষ হাতে দা দিয়েই সব কেটে-ছিড়ে নিখুঁতভাবে পরিস্কার করে রান্না চাপিয়ে দিলেন। তারপর আমরা ছালাতে দাঁড়ালাম। ঘরভর্তি লোকগুলো কৌতূহল নিয়ে আমাদের ছালাত দেখল। রান্না শেষ হতে রাত্রি ১০-টা পার। খুব তৃপ্তির সাথে খেলাম সবাই। পাহাড়ে অধিকাংশ বাড়ীতে সোলার প্যানেল আছে। খ্রিষ্টান এনজিওগুলো সামান্য টাকার কিস্তিতে এসব সুবিধা সরবরাহ করে যাচ্ছে। এ বাড়ীতে টিভি, একাধিক ডিভিডি প্লেয়ার, মোবাইল সবকিছুই দেখলাম। সবই এরা চালাচ্ছে সোলার দিয়ে। তবে এ পর্যন্ত কোন বাড়ীতে খাট থেকে শুরু করে সামান্যতম কোন ফার্নিচারের হদিস পেলাম না। চালের বাঁশে টানানো বেতের দড়ি এদের আলনা। তবে এ পর্যন্ত থাকা সব বাড়ীগুলোই খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাজানো গোছানো দেখেছি। সামান্য ময়লা পড়লেও এরা সাথে সাথে ঝাড়ু দিয়ে দিচ্ছে। মজার ব্যাপার হল, ঘরের সবখানে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না। কেবল বাঁশের দেওয়ালের নির্দিষ্ট বাঁশে মোবাইল রাখলেই পাওয়া যায়। যাইহোক প্রতি রাতের মত নিয়মমাফিক শরীরে তেল মাখা ও পরিমাণমত মধু খেয়ে রাত সাড়ে ১১-টায় আমরা ঘুমিয়ে গেলাম। *(ক্রমশ)*

আলোকপাত

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

প্রশ্ন (০৪/০১) : সাম্যবাদ কী? ইসলামের সাথে সাম্যবাদের সাংঘর্ষিক দিকগুলো কী কী?

-মুহাম্মাদ মেছবাহুল আলম জুয়েল
আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : ১৮৪৮ সালে কার্লমার্কস (১৮১৮-১৮৮৩ খৃঃ) ও এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৬ খৃঃ) সমাজতন্ত্রের ইশতেহার প্রকাশ করে সাম্যবাদের সূচনা করেন। তারা শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সর্বহারা মানুষের মুক্তি কামনা করেন। তারা মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সমূলে হরণ করতে চেয়েছেন। যেমন- কার্লমার্কস স্রষ্টাকে অস্বীকার করে বলেছেন,

It is not religion that creates man but man who creates religion. Religion is the groan of the down frodden creature. It is the opium..... the idea of God must be destroyed.

'ধর্ম মানুষকে সৃষ্টি করেনি; বরং মানুষই ধর্ম সৃষ্টি করেছে। ধর্ম নিপীড়িত মানবগোষ্ঠীর মূর্ত আর্তনাদ। এটা আফিম... সুতরাং আল্লাহ্র কল্পনা মানুষের মন থেকে উৎখাত করতে হবে'। তার সহচর এঙ্গেলস বলেন, The first world of Religions is a lie. 'ধর্মের প্রথম শব্দটাই মিথ্যা (আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস)' *(ইসলাম বনাব কমিউনিজম, পৃঃ ১২)*।

ইসলামের সাথে সাম্যবাদের সাংঘর্ষিক দিক সমূহ :

প্রথমতঃ এটা স্রষ্টা বিরোধী মতবাদ। যারা এই মতবাদে বিশ্বাসী তারা কার্লমার্কসের মত আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। তারা মূলতঃ আল্লাহদ্রোহী ফেরাঊনের অনুসারী। যারা আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে তাদের বিরুদ্ধে এই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালিত হয়। তাই কার্লমার্কস ধর্ম সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য উল্লেখ করেছেন। তবে তার বক্তব্য আংশিক সঠিক। কারণ একশ্রেণীর মানুষ খানকা বা গীর্জায় বসে ধর্ম তৈরি করে নিরীহ মানুষের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে এবং অত্যাচার করছে। মূলতঃ দ্বীন বা ইসলামের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। আর প্রত্যেক মানুষই ইসলাম ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী, খ্রীস্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায় *(রূম ৩০; বুখারী হা/১৩৮৫)*। অর্থাৎ ধর্মহীন করে দেয়। তাই কার্লমার্কস নিজেও ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করেছেন। পরে পিতা-মাতা ও পরিবেশ তাকে ইহূদী বানিয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ এটা চরমপন্থী মতবাদ। তারা সকল মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মানবতার উপর অত্যাচার করেছে। এ মতবাদের কারণে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ১৯১৭ সালে লেলিন রাশিয়ায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও তা ছিল লক্ষ-কোটি মানুষের রক্তে রঞ্জিত শাসন ব্যবস্থা। অনুরূপ মাওসেতুং চীনে মডারেট সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেও সেখানে তিনি ২ কোটি মানুষকে হত্যা করেছেন। ইসলামের নামে খারেজীরা মানুষ হত্যা করলেও এ সমস্ত আধুনিক সন্ত্রাসীদের তুলনায় তা কিছুই না।

অতএব কোন মুসলিম ব্যক্তি এমনকি কোন অমুসলিম ব্যক্তিও উক্ত মতবাদের অনুসারী হতে পারে না। দুঃখ হয় তখন যখন একশ্রেণীর মুসলিম নামধারী ব্যক্তিদেরকে উক্ত দর্শনের পক্ষে আন্দোলন করতে দেখা যায়। তারা এই মতবাদের গোড়ার কথা মোটেও জানে না।

প্রশ্ন (০৪/০২) : কুরআন জমাকরণের ঘটনা জানতে চাই?

-সাখাওয়াত হোসাইন, রাজশাহী।

উত্তর : ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা আবুবকর (রাঃ)-এর সময়ে পূর্ণাঙ্গ কুরআন সংরক্ষণ হয়। যদিও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে কুরআন লিপিবদ্ধ হয়েছিল; কিন্তু একত্রিত করে সংরক্ষণ হয়নি। যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ), যিনি অহি লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন, আবুবকর (রাঃ) (তাঁর খেলাফতের সময়) এক ব্যক্তিকে আমার কাছে ইয়ামামার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন। (আমি তার কাছে চলে আসলাম) তখন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তাঁর নিকট ছিলেন। তখন আবুবকর (রাঃ) বললেন, 'ওমর আমার কাছে এসে বললেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধ তীব্র গতিতে চলছে, আমার ভয় হচ্ছে কুরআনের অভিজ্ঞগণ (হাফিযগণ) এই যুদ্ধে শহীদ হয়ে যায় না-কি। যদি আপনারা তা সংরক্ষণ ব্যবস্থা না করেন তবে কুরআনের অনেক অংশ চলে যেতে পারে। (এই মুহূর্তে) কুরআনকে একত্রিত সংরক্ষণ করা ভাল মনে করি'। আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমি ওমর (রাঃ)-কে বললাম, আমি এ কাজ কিভাবে করতে পারি, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করে যাননি। কিন্তু ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটা কল্যাণকর কাজ। ওমর (রাঃ) তাঁর এ কথার পুনরুক্তি করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ কাজ করার জন্য আমার অন্তর খুলে দিলেন এবং আমিও ওমর (রাঃ)-এর মতোই মতামত পেশ করলাম। যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) সেখানে নীরবে বসে ছিলেন, কোন কথা বলছিলেন না। এরপর আবুবকর (রাঃ) আমাকে বললেন, দেখ, তুমি যুবক এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। আমরা তোমার প্রতি কোনরূপ খারাপ ধারণা রাখি না। কেননা তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে অহি লিপিবদ্ধ করতে। সুতরাং তুমি কুরআনের আয়াত সংগ্রহ করে একত্রিত কর। আল্লাহ্র কসম! তিনি কুরআন একত্রিত করার যে নির্দেশ আমাকে দিলেন সেটি আমার কাছে এমন ভারি মনে হল যে, তিনি যদি কোন একটি পর্বত স্থানান্তর করার আদেশ দিতেন তাও আমার কাছে এমন ভারী মনে হত না। আমি বললাম, যে কাজটি নবী করীম, (ছাঃ) করে যাননি, সে কাজটি আপনারা কিভাবে করবেন? তখন আবুবকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটা কল্যাণকর। এরপর আমিও আমার কথার উপর বারবার জোর দিতে লাগলাম। শেষে আল্লাহ যেটা বুঝার জন্য আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর অন্তর খুলে দিয়েছিলেন, আমার অন্তরকেও তা বুঝার জন্য খুলে দিলেন। এরপর আমি কুরআন সংগ্রহে লেগে গেলাম এবং হাড়, চামড়া, খেজুরের ডাল ও বাকল এবং মানুষের স্মৃতি থেকে তা সংগ্রহ করলাম। অবশেষে খুযায়মা আনছারী (রাঃ)-এর কাছে সূরা তওবার দু'টি আয়াত পেয়ে গেলাম, যা অন্য কারও নিকট হতে সংগ্রহ করতে পারিনি। (আয়াতটি হল) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ শেষ পর্যন্ত। এরপর এ কুরআন আবুবকর (রাঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছেই জমা

ছিল। তারপর ওমর (রাঃ)-এর কাছে। অতঃপর তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এটি তাঁর কাছেই ছিল। তারপর ছিল হাফছাহ বিনতে ওমর (রাঃ)-এর কাছে *(বুখারী হা/৪৬৭৯)*।

প্রশ্ন (০৪/০৩) : 'কোয়ান্টাম মেথড' সম্পর্কে জানতে চাই?

-আব্দুছ ছাত্তার, নওগাঁ

উত্তর : এটি একটি শয়তানী কুমন্ত্রণা ও জাহেলী মতবাদ। এটা ধ্যান ও ব্যায়ামের মাধ্যমে আত্মা ও স্বাস্থ্যকে ভাল রাখার একটি ধোঁকাতন্ত্র মাত্র। এটা মূলতঃ তথাকথিত 'ছূফীবাদ'-এর নব সংস্করণ। আর ছূফীবাদ যে, গ্রীক, পারসিক, হিন্দু ও খ্রীস্টান সভ্যতার আলোকে সৃষ্ট একটি ভ্রান্ত দর্শন তা পরিষ্কার। দৈনিক আজাদ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক শহীদ আল বোখারী মহাজাতক ১৯৭৩ সাল থেকে অকাল্ট ও অতীন্দ্রিয় সম্পর্কে ঢাকা ডাইজেস্ট পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে তার প্রাথমিক চিন্তার সূচনা করেন। ১৯৭৫ সালে যুক্তরাজ্যের ডা. হার্বার্ট বেনসনের মেডিটেশন গবেষণার প্রতি তিনি অনুপ্রাণিত হন এবং ১৯৮০ সালে মেডিটেশন (Medetation) ধ্যানের আবিষ্কার করেন। অতঃপর তারই সূত্র ধরে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে আধুনিক জীবনযাপনের বিজ্ঞান নামে ১৯৯৩ সালে উদ্ভাবন করেন 'কোয়ান্টাম মেথড'। যার প্রথম ধাপ হল 'শিথিলায়ন', যা মনের মধ্যে ধ্যানাবস্থা সৃষ্টি করে। আর এর শেষ ধাপ হল মহা চৈতন্য (Super Conciousness)। কোয়ান্টামের পাঁচটি সূত্র রয়েছে- প্রশান্তি, সুস্বাস্থ্য, প্রাচুর্য, সুখী পরিবার ও ধ্যান। ১৯৯৩ সালের ৭ জানুয়ারী হোটেল সোনারগাঁও-এ কোয়ান্টাম মেথডের ১ম কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এ সমস্ত কোর্সে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদস্থ ব্যক্তিকে অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করা হয়। এখানে মুসলিম, হিন্দু, খ্রীস্টান, ইহূদী প্রভৃতির ধর্মের লোক ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের যাতায়াত রয়েছে। যারা এখানকার ধ্যান সাধনায় উত্তীর্ণ হয়, তাদেরকে 'কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট' বলে। এই মতবাদের সবচেয়ে ভ্রান্ত আক্বীদা হল, তারা প্রত্যেক ধর্ম ও মতবাদকে সঠিক বলে মনে করে। তাই সব ধর্মের সমন্বয়ে সৃষ্ট 'কোয়ান্টাম মেথড' হল প্রকাশ্য কার্যক্রম পরিচালনার তথাকথিত এক আধুনিক বিজ্ঞান। কোন মুসলিম ব্যক্তি এই প্রতারণার ফাঁদে আটকা পড়তে পারে ন *(বিস্তারিত দ্র. মাসিক আত-তাহরীক, সম্পাদকীয়, আগস্ট ২০১২)*।

প্রশ্ন (০৪/০৪) : ইহূদী নিয়ন্ত্রিত পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ মিডিয়া ফার্ম কয়টি ও কী কী? বিস্তারিত জানতে চায়।

-আব্দুল্লাহ আল-মুজাহিদ, সাতক্ষীরা

উত্তর : ইহূদী নিয়ন্ত্রিত পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ মিডিয়া ফার্ম মোট ৫টি। যথা- (১) ওয়ালেট ডিজনী : এটি পৃথিবীর বৃহত্তম মিডিয়া কোম্পানী। ১১টি এস.এম রেডিও, ১০টি এফ.এম রেডিও চ্যানেল এবং পৃথিবীর ২২৫টি টিভি চ্যানেল স্টেশন এই 'ওয়ালেট ডিজনী' কোম্পানীর সাথে জড়িত। সর্ববৃহৎ এই কোম্পানীটি এক্সিকিউটিভ 'মাইকেল এজেন্স' নামক এক ইহূদীর। শুধু তাই নয় কোম্পানীর সকল ডাইরেক্টর, কলা-কুশলী, ম্যানেজার এবং ছোট-বড় সকল কর্মকর্তা ইহূদী। (২) টাইম ওয়ানার : এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মিডিয়া কোম্পানী। পৃথিবীর সর্বাধিক পাঠক নন্দিত ৫টি ম্যাগাজিন, টাইম স্পোর্টস, ইলাস্ট্রেটেট পিপল এবং পার্সন এরা প্রকাশ করে। এ কোম্পানীর মালিক 'ওগা রোনিওন' নামক ইহূদী। এ কোম্পানীর ১১০টি দফতর ও ব্যুরো অফিসের একশ ভাগ কর্মচারী সকলেই ইহূদী। (৩) ভায়াকম বা প্যারামাউন্ট : এটি পৃথিবীর তৃতীয় বৃহৎ মিডিয়া কোম্পানী। পৃথিবীর তরুণ প্রজন্মের সর্বাধিক প্রিয় 'এম টিভি'। শিশুদের সর্বাধিক প্রিয় টিভি 'নাইন লোটান' নামক চ্যানেলের মালিক এ কোম্পানী। এ কোম্পানীটিও জনৈক 'সামার রেড স্টোন' নামক এক ইহূদীর মালিকানাধীন। এখানে সাধারণ কর্মকর্তা হতে চিফ এক্সিকিউটিভ পর্যন্ত সকল কর্মচারীই ইহূদী। (৪) নিউজ কালেকশন : এটি পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মিডিয়া কোম্পানী। একটি ফ্লিম ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানী ও বড় টিভি চ্যানেল এ কোম্পানীর আওতাভুক্ত। এই কোম্পানীতে ইহূদী ছাড়া অন্য কারও জন্য চাকুরীর দরজা খোলা নাই। (৫) জাপানের SONY : পৃথিবীর পঞ্চম শীর্ষ মিডিয়া কোম্পানী। এই কোম্পানীও ইহূদীদের আওতাভুক্ত।

প্রশ্ন (০৪/০৫) : মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ)-এর শাহাদতের ঘটনা জানতে চাই?

-আব্দুল্লাহ মাসঊদ, মঠবাড়ী, সাতক্ষীরা

উত্তর : মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ) ওহোদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। এই যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর ইবনু কুমায়া ও তার সাথীদের উপর্যুপরি হামলা প্রতিরোধ করেন। তার হাতেই ছিল ইসলামী বাহিনীর পতাকা। শত্রু সৈন্যরা তার ডান হাতে এমন জোরে তলোয়ার মারে, যাতে তার হাত কেটে যায়। এরপর তিনি বাম হাতে পতাকা তুলে ধরেন এবং কাফের বাহিনীর সামনে স্থির অবিচল থাকেন। অবশেষে তাঁর বাম হাতও কেটে যায়। তিনি তখন তাঁর হাঁটুতে ঠেস দিয়ে বুক ও ঘাড়ের সাহায্যে পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন। এ অবস্থায় তিনি শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর খবর মক্কার অলিতে-গলিতে প্রচার হতে থাকে। এক সময় তার স্ত্রী ওমনা বিনতু জাহসের নিকট পৌঁছল। এ খবর শুনে তার স্ত্রী হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, প্রত্যেক নারীর স্বামীই তার কাছে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ২৬৫)*। অতঃপর তাঁর দাফনের দৃশ্য ছিল আরো করুণ ও বেদনাদায়ক। তাকে দাফন দেওয়ার জন্য এক প্রস্থ চাদর ছাড়া কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল না। যা তিনি রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা ঢাকে না আর পা ঢাকলে মাথা ঢাকে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত দুঃখ ও ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেন, 'চাদর দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও, আর পা 'ইযখির' ঘাস দিয়ে ঢেকে দাও' *(বুখারী হা/৩৮৯৭)*।

প্রশ্ন (০৪/০৬) : সূদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য কী?

-আসাদুযযমান
কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তর : অনেকে সূদ ও মুনাফাকে একই মাপকাঠিতে বিচার করেন। এমনকি 'সূদ তো মুনাফার মতই' এতদূর পর্যন্তও বলতে কছুর করেন না। অথচ এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। যথা : (ক) সূদ হল ঋণের শর্ত অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণদাতাকে মূল অর্থের সাথে প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ। পক্ষান্তরে মুনাফা হল উৎপাদনের মূল্য ও উৎপাদন খরচের পার্থক্য। (খ) সূদ পূর্ব নির্ধারিত। অপরপক্ষে মুনাফা অর্জিত হয় পরে। (গ) সূদে কোন ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা নেই। অপরপক্ষে কোন উদ্যোগে বা কারবারে মুনাফা না হলে লোকসানও হতে পারে। এক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহকারী এবং উদ্যোক্তা উভয়ের ক্ষেত্রেই ঝুঁকি ও অনিশ্চিয়তা বিদ্যমান। (ঘ) সূদ কখনোই ঋণাত্মক হতে পারে না। বড় জোর খুবই কম বা তাত্ত্বিকভাবে শূন্য হতে পারে। মুনাফা ধনাত্মক, শূন্য এমনকি ঋণাত্মক (অর্থাৎ লোকসানও) হতে পারে। (ঙ) সূদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করে না। পক্ষান্তরে মুনাফা উদ্যোক্তা ও পুঁজির যোগানদাতার সময় ও শ্রম বিনিয়োগের ফল।

সংগঠন সংবাদ

যেলা সংবাদ : জয়পুরহাট

শীতবস্ত্র বিতরণ

কমরগ্রাম, জয়পুরহাট, ২ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৩ টায় কমরগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে প্রায় দুইশত অসহায় ও শীতার্তের মাঝে শীতবস্ত্র হিসাবে নতুন কম্বল বিতরণ করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মদ আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি উলফত মোল্লা, অত্র উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামরুল হক্ব মা'ছূম, ৪ নং ওয়ার্ডের মেম্বর গোলাম মোর্শেদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক আসাদুয্যামান বাবু, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুন নূর, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক্ব, সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাক্ব আহমাদ, যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক মোনায়েম হোসেন প্রমুখ।

উপযেলা কমিটি গঠন

সোনাপুর, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট ২৬ ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ সোনাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' পাঁচবিবি উপযেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উপযেলা 'যুবংসঘে'র সভাপতি আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক্ব। পরিশেষে আশরাফুল ইসলামকে সভাপতি এবং নাজমুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট পাঁচবিবি উপযেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

তালশন নলপুকুর, জয়পুরহাট, ২৮ ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য দুপুর ২.০০ ঘটিকার সময় তালশন নলপুকুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' ক্ষেতলাল উপযেলা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুবকরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রচার সম্পাদক ফিরোজ হোসেন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আল-আমীন। পরিশেষে শাহাদাত হোসেনকে সভাপতি এবং শাফিউল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট ক্ষেতলাল উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য, উপযেলা কমিটি গঠন শেষে নূর মুহাম্মাদকে সভাপতি এবং আবু রায়হানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্টি বুড়াইল 'যুবসংঘ' শাখা গঠন করা হয়।

কালাই, জয়পুরহাট, ৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ১১ টায় কালাই জুম্মাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' কালাই উপযেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। কালাই উপযেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুস্তাক্ব আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আল-আমীন। পরিশেষে আবুল কাশেমকে সভাপতি এবং আবুল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কালাই উপযেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

কমরগ্রাম, জয়পুরহাট ১৯ ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ কমরগ্রাম আহলেহাদীছ বড় জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' জয়পুরহাট সদর উপযেলা কমিটি পুনর্গঠন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সদর উপযেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আল-আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলবৃন্দ। পরিশেষে নাজমুল হক্বকে সভাপতি ও আসাদুযযামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট সদর উপযেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সরকারী কলেজ কমিটি গঠন

সরকারী কলেজ, জয়পুরহাট, ২৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর জয়পুরহাট শহরে আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' জয়পুরহাট সরকারী কলেজ শাখা কমিটি পুনর্গঠন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কলেজ শাখা 'যুবসংঘে'র সভাপতি নাজমুল হক্বের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, বর্তমান প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুবকর ছিদ্দীক। পরিশেষে মুহাম্মাদ যাকারিয়াকে সভাপতি এবং মাজেদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কলেজ শাখা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সুধী সমাবেশ

বাখড়া, কালাই, জয়পুরহাট ৩০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর বাখড়া দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। আলহাজ্জ মকবুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম। প্রধান অতিথি জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনান্তে উপস্থিত যুবকদের 'যুবসংঘ', ছোট বাচ্চাদের 'সোনামণি', বয়স্কদের 'আন্দোলন' এবং মহিলাদেরকে 'আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা'র অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন করার উদাত্ত আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক্ব। পরিশেষে মমতাযুর রহমানকে সভাপতি এবং রিপন মণ্ডলকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট বাখড়া দক্ষিণপাড়া 'যুবসংঘ' শাখা গঠন করা হয়।

যেলা সংবাদ : সাতক্ষীরা

উপযেলা গঠন

চরেরবিল, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা ৯ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ শ্যামনগর চরেরবিল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্জ মাওলানা আলতাফ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্যামনগর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর

সভাপতি মাওলানা মতিউর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সাধারণ সম্পাদক হাফীযুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক ইবাদুল্লাহ বিন আব্বাস, প্রচার সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম। পরিশেষে আমির হোসেনকে সভাপতি এবং মুস্তাকীম বিল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট শ্যামনগর উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়।

কলারোয়া, সাতক্ষীরা ২৩ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর কলারোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে 'যুবসংঘ'-এর কলারোয়া উপযেলা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্জ মাওলানা আলতাফ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক প্রভাষক মোফলেহুর রহমান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাষ্টার কামারুযযামান, উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রবীউল হক্ব, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আনওয়ার ইলাহী, সাবেক সহ-সভাপতি অধ্যাপক হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর বর্তমান সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সাধারণ সম্পাদক হাফীযুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক ইবাদুল্লাহ বিন আব্বাস, অর্থ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, প্রচার সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুছত্বফা কামাল সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর সদস্যবৃন্দ। অবশেষে মুহাম্মাদ লিয়াকত আলীকে সভাপতি এবং মুছত্বফা কামালকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘ' কলারোয়া উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়।

এলাকা গঠন

পলাশপোল, সাতক্ষীরা ১৬ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর পলাশপোল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ছাত্র ও যুবসমাবেশের আয়োজন করা হয়। 'যুবসংঘ'-এর সাতক্ষীরা সদর এলাকার সভাপতি মুজাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাহমুদপুর সীমান্ত আদর্শ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আযীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্জ ডাঃ মুহাম্মাদ আবুল বাশার, ডাঃ মুহাম্মাদ মনোয়ার হোসেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্জ মাওলানা আলতাফ হোসেন, 'আন্দোলন'-এর সদর উপযেলা সভাপতি আব্দুল খালেক, অর্থ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মালেক, প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম, নবারন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল মালেক, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ-আল-মামূন, প্রচার সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে দুইশতাধিক ছাত্র, যুবক ও সুধী উপস্থিত ছিলেন। অবশেষে আসাদুল্লাহ বিন-মুসলিমকে সভাপতি এবং কে. এম নাছির উদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট সাতক্ষীরা সদর এলাকা গঠন করা হয়।

পোড়ার বাজার, নগরঘাটা, সাতক্ষীরা ১৮ জানুয়ারী রবিবার : অদ্য বাদ আছর তালা উপযেলার অন্তর্গত নগরঘাটার পোড়ার বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সদ্য সাবেক সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সাধারণ সম্পাদক হাফীযুর রহমান, উপযেলা সভাপতি মাওলানা আযীযুর রহমান এবং উপযেলার বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ। পরিশেষে মুহাম্মাদ কামারুযযামানকে সভাপতি এবং রাসেল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘ' নগরঘাটা এলাকা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

আখড়াখোলা, সাতক্ষীরা ১৯ জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ আছর সাতক্ষীরা সদর উপযেলাধীন 'যুবসংঘ' আখড়াখোলা এলাকা পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল মান্নান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসেন, 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ বিন মুসলিম, সাধারণ সম্পাদক হাফীযুর রহমান, প্রচার সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ও কাকডাঙ্গা সিনিয়ার ফাযিল মাদরাসার শিক্ষক মাওলনা শহীদুল্লাহ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর রহমান সহ এলাকার দায়িত্বশীলবৃন্দ। পরিশেষে আবু রায়হানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘ' আখড়াখোলা এলাকা কমিটি গঠন করা হয়।

ধানদিয়া চৌরাস্তা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ২৫ জানুয়ারী, রবিবার : অদ্য বাদ আছর ধানদিয়া চৌরাস্তা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তালা উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আযীযুর রহমানে সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক হাফীযুর রহমান। উক্ত বৈঠকে হাফেয আরিফুযযামানকে সভাপতি এবং তরিকুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট বাঁটরা এলাকা কমিটি গঠন করা হয়।

যেলা সংবাদ : যশোর

ইসলামী সম্মেলন

মনিরামপুর, যশোর ২৫ নভেম্বর ২০১৪ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর মনোহরপুর দাখিল মাদরাসা মাঠে 'যুবসংঘ'-এর মনোহরপুর শাখার উদ্যোগে 'ইসলামী সম্মেলন ২০১৪' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী-এর মুহাদ্দিছ ও পিস টিভি বাংলার আলোচক শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আন্দোলন'-এর খুলনা যেলা সভাপতি ও পিস টিভি বাংলার আলোচক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বযলুর রশীদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি ও 'সোনামণি'-এর যেলা পরিচালক আশরাফুল আলম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা তরিকুল ইসলাম, কেশবপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মুত্তালিব বিন ঈমান প্রমুখ।

আইকিউ

[কুইজ-১; কুইজ-২; বর্ণের খেলা-৩ ও সংখ্যা প্রতিযোগ-৪-এর সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ২০ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সর্বোচ্চ উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। বিভাগীয় সম্পাদক]

কুইজ ১/৮ (১) :

১. দ্বীনের সত্যায়ন ও একনিষ্ঠতার চিহ্ন কী?
২. সংগঠনের মূল চালিকা শক্তি কারা?
৩. রাসূলগণের দাওয়াতের চাবি কী?
৪. ইলম পূর্ণতা লাভকারী বৈশিষ্ট্য কয়টি?
৫. সা'দ (রাঃ) সম্পর্কে কুরআনের কয়টি আয়াত নাযিল হয়?
৬. বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
৭. হলুদ সাংবাদিকতা শব্দটি কতসালে প্রথম ব্যবহার হয়?
৮. বর্তমানে দেশের বন এলাকার পরিমাণ কত?
৯. 'বড় হযরত' কার উপাধী ছিল?
১০. 'ইজতিহাদ'-এর শর্ত কয়টি?
১১. 'আল-মা'আরিফ' পত্রিকার সম্পাদক কে?
১২. বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম কী?
১৩. কার্লমার্কস কত সালে সাম্যবাদ আবিষ্কার করে?
১৪. 'কাতেবীনে অহি'-এর সংখ্যা কত জন?
১৫. 'কোয়ান্টাম মেথড' কত সালে আবির্ভূত হয়?

গত সংখ্যার কুইজের উত্তর : ১. ৩ লক্ষ ২. পাঁচ শতাধিক ৩. ২০২-২৭৫ হিঃ ৪. ২টি ৫. ১০০ কি.মি. ৬. শাওকানী ৭.আহলেহাদীছগণ ৮.৫টি ৯. কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ১০. ১৯ শতকের মাঝামাঝি ১১.যথাক্রমে ১৯৮৭ ও ১৯৬২ সালে ১২. ৩০ বছর ১৩. তৃতীয় শতাব্দীকে ১৪. ইরান ১৫. ৫০ বছর।

গত সংখ্যায় বিজয়ীদের নাম : মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম (মুচড়া, সাতক্ষীরা) ২. মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (ভাটপাড়া, সাতক্ষীরা) ৩. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী)।

কুইজ ২/৮ (২) :

১. পৃথিবীতে প্রথম মানবের নাম কী?
২. পৃথিবীতে প্রেরিত প্রথম নবীর নাম কী?
৩. মানুষ কি বানরের বংশধর?
৪. 'বিবর্তনবাদ'-কে এবং কত সালে আবিষ্কার করেন?
৫. মানুষের আদি পিতা কে?
৬. হাওয়া (আঃ)-কে কোথা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে?
৭. মানুষের উপর শয়তানের প্রথম হামলা কি ছিল?
৮. উম্মতগণের নিকট থেকে কি প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়?
৯. খলীফা হিসাবে মানুষের প্রধান কাজ কী?
১০. পৃথিবীর প্রথক কৃষি পণ্য কি ছিল?

গত সংখ্যার কুইজের উত্তর : ১. দো'আ ও রহমত ২. নবুঅত প্রাপ্তি পর থেকেই ৩. দুই ওয়াক্ত ৪. মি'রাজের রাত্রিতে ৫. যোহর ছালাতের ৬. কাফের ও জাহান্নাম এবং ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত ৭. বাজার ৮. যে মসজিদ মুমিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় ৯. ২টি ১০. ৯টি ১১. ৭টি ১২. পবিত্রতা অর্জণ করা ১৩. না ১৪. সংকল্প করা ১৫. পরস্পর চুপিচুপি কথা বলা।

গত সংখ্যায় বিজয়ীদের নাম : ১. শরীফুল ইসলাম (ভাটপাড়া, সাতক্ষীরা) ২. আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ (নওদাপাড়া, রাজশাহী) ৩. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী)।

বর্ণের খেলা ৩/৮ :

নির্দেশনা :

বৃত্তের প্রতিটি অংশে একটি করে অর্থবোধক শব্দ দেয়া আছে। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি কিংবা দুটি অক্ষর খুঁজে পাবেন না। এ বর্ণগুলো বের করে পুনর্বিন্যাস করলে শ্রেষ্ঠ নবীর নামের মধ্যে একটা নাম জানা যাবে।

১.....
২.....
৩.....
৪.....

অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম.....

গত সংখ্যার বর্ণের খেলার উত্তর : ১. ইখলাছ ২. বারাআত ৩. তাদরীস ৪. তাকবীর; **অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম : ইবাদাত**

গত সংখ্যায় বিজয়ীদের নাম : ১. আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ (নওদাপাড়া, রাজশাহী) ২. মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) ৩. তামান্না তাসনীম (কুড়িগ্রাম)।

সংখ্যা প্রতিযোগ ৪/৮:

নির্দেশনা :

খোপের নিচে দেওয়া চারটি সংখ্যা প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম খোপে বসবে। এবার দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ খোপে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলো এমনভাবে বসান, যাতে উত্তরটি অবশ্যই সমান চিহ্নের ডান পাশে দেওয়া সংখ্যাটির সমান হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করতে পারবেন। তবে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলোর মধ্যে কোনটি একাধিকবারও ব্যবহার করা যেতে পারে।

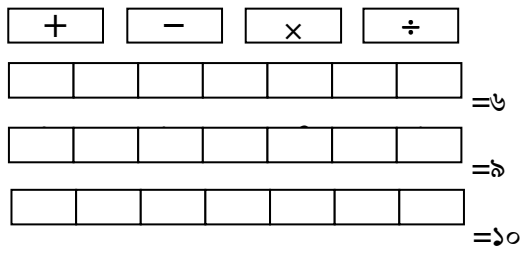

১২ ৩ ৯ ৬

গত সংখ্যার সংখ্যা প্রতিযোগের উত্তর : (১) ৯÷৩+২+৪= ৯ (২) ৫×২−৬+১=৫ (৩) ৭−১+৪−২= ৮

গত সংখ্যায় বিজয়ীদের নাম : ১. আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ (নওদাপাড়া, রাজশাহী) ২. আব্দুল মুমিন (সিরাজগঞ্জ) ৩. আশরাফুল ইসলাম (যশোর)।

*[**উত্তর পাঠানোর ঠিকানা** : বিভাগীয় সম্পাদক, আই কিউ, তাওহীদের ডাক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২]*